তত্ত্বকথা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম. এ.

অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ।

চট্টগ্রাম,

হার্ডিঞ্জ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

শ্রীবঙ্গচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২৪

মূল্য ৸৹ আনা।

দেবায় তস্মৈ নমঃ।

পরমভাগবত

শ্রীলশ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

মহোদয়ের শ্রীকরকমলেষু।

গঙ্গা যেমন শিবের জটায় সঞ্চিত না থাকিয়া বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অজস্রধারায় নিত্য প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, আপনার ধনস্রোতও তেমনি অশেষ সৎকার্য্যের মধ্য দিয়া আপনার স্বদেশকে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। জনপ্রীতির মধ্যে আপনার দেবপ্রীতি সার্থক হইয়াছে। দুগ্ধ যেমন দুর্ব্বলের মধ্যে বল সঞ্চার করে, সঞ্জীবনী যেমন রোগীর মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করে, আপনার দয়ার উৎসও তেমনি পিপাসুর মুখে অমৃতবর্ষণ করিতেছে।

আমার গৃহে গ্রন্থালয় স্থাপন করিয়া আপনি আমার শাস্ত্র চর্চ্চার কাজে নিয়োগ করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন, আমার চিরদিনের আশা সফল করিয়াছেন। সমস্ত হৃদয় আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতায়

পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আপনি দেবদূত, আপনার এ দান দেবতার করুণাবর্ষণ। হৃদয়ের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারি এমন ভাষা নাই। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করিলাম। আপনার দেবস্পর্শে ইহা আশীর্ব্বাদময় হইয়া উঠুক ও আমাকে আপনার দানের যোগ্য করিয়া তুলুক।

বিনীত—

শারদীয়া পূজা, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

১৩২৪, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম কলেজ।

অজ্ঞেয়—অথচ এই অবিদ্যার সহিত জ্ঞানের কেমন করিয়া সম্বন্ধ হইল তাহা তাঁহারা বুঝাইতে পারিলেন না—অথচ অবিদ্যা হইলেও ইহার মধ্যের শৃঙ্খলা ও নিয়ম অস্বীকার করিবার উপায় ছিলনা—কাযেই এই অবিদ্যাকেই তাঁহাদের মায়াশক্তিরূপে বুঝিতে হইল—এই মায়ার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ স্থাপনের যত আপত্তি তাহাতেই ব্রহ্মকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টার লাঞ্ছনা—

২৫—৪৪ পৃষ্ঠা।

রামানুজ আসিয়া বলিলেন মায়াশক্তি ঈশ্বরের শক্তি—জীব, জড়, ঈশ্বর এসমস্ত নিয়েই তিনি—কিন্তু এখানেও সত্যকে ক্রিয়াস্বরূপের মধ্যে দেখা হোলনা বলে ত্রুটি রয়ে গেল—এবং তাহার ফলেই রামানুজ দর্শনেও নানা দোষ রয়ে গেল—এবং সেই জন্যই অন্যান্য বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টি।

৪৪—৫০ পৃষ্ঠা।

জড়ের মধ্যে সত্যকে আমাদের দেশীয়েরা তেমন ভাবে স্বীকার করিতে পারেন নাই বলিয়া জড়শাস্ত্রও আমাদের দেশে তেমন স্ফূর্ত্তি পায় নাই—ও জড়ের দিক্ থেকে নানা সাজা এসেছে—উভয়

রূপই সত্যের মূর্ত্তি কাযেই উভয়কে স্বীকার না করিলেই শাস্তি।

সত্যের যথার্থ স্বরূপই এই, যে আপনার অপ্রকাশ বা তিরোহিত স্বভাবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ আপনাকে স্বপ্রকাশ করা—এই অপ্রকাশের দিক্‌টাই সত্যের অন্তর্নিহিত বাধা (Negation)

জ্ঞান বা বস্তুমাত্রই, এই সত্য ও বাধার মিলন-ময় রূপ—ক্রিয়াস্রোতের মধ্যদিয়া এই বাধাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাওয়াই সত্যের স্বাভাবিক রূপ ও গতি। সত্যের প্রত্যেক বিকাশের মধ্যে একটা অলব্ধ ও লব্ধব্য রূপ রহিয়াছে—সেই অলব্ধ মূর্ত্তিকে প্রকাশ করিবার জন্য, সত্য ক্রিয়াময় হইয়া উঠেন এবং এই চেষ্টাতেই ভূমা হইতে ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুজগতের সৃষ্টি—ভূমার কাছে ক্ষুদ্র লব্ধব্য ও ক্ষুদ্রের কাছে ভূমা লব্ধব্য।

৫০—৬৩ পৃষ্ঠা।

বিরাট মানবজাতিরূপে সত্যের যে বিরাট রূপ হইয়াছে, তাহাই আত্মলাভের জন্য স্তরে স্তরে জাতি, সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতি বিভাগের মধ্য দিয়া একেবারে ব্যক্তিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ক্রমশঃ

বাঁধিবার চেষ্টার অপরাধের ফলেই কাণ্টের দার্শনিকতার গলদ—এই ব্যক্তিত্বের ঝোঁকেই তিনি বিবেকের বাণীকে সমাজের বাণীরূপে বুঝিতে পারেন নাই— বড় বড় লোকেরাও অনেক সময় সমাজের বোধকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

৮০—৯৬ পৃষ্ঠা।

কিন্তু সময় সময় এমন এক একজন লোকাতিশায়ী পুরুষ বা মহাপুরুষ আসেন যাঁহারা সমাজের দৈন্যের সময়ও সমাজকে অতিক্রম করে, বিরাটের আদর্শে চলতে পারেন—রাষ্ট্রচৈতন্যের পরিবর্ত্তনের জন্য যেমন লোকাতিশায়ী পুরুষের (World Historical individuals) জন্ম, ধর্ম্মচৈতন্যের পরিবর্ত্তনের জন্য তেমনি মহাপুরুষদের জন্ম—খ্রীষ্ট—তাঁহার নববোধি—বুদ্ধ—শ্রীচৈতন্য—শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের বিশেষত্ব—তত্ত্বের স্বরূপের পুনরালোচনা—কি তর্কশাস্ত্র, কি মনোবিজ্ঞান, কি নীতি, কি ধর্ম্ম, যেদিক্ দিয়াই দেখা যাক্, সব দিক্ দিয়াই তত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তির মধ্যে দেখিতে পাই সসীম ও অসীমের মিলন।

ব্যাপকতর মূর্ত্তির অনুকূলে চলাই ব্যাপ্যতর মূর্ত্তির কর্ত্তব্য ও আদর্শ, ইহার বিপর্য্যয়েই শাস্তি। কোনও জাতি মানবজাতির বিকাশের আদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই তার শাস্তি অনিবার্য্য। ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়েও একরূপই বিধান। কারণ ব্যাপ্য সত্তা (Particular) ব্যাপক সত্তারই (Universal) বিকাশ। কাজেই ব্যাপকের প্রতিকূলাচরণেই ব্যাপকের অপরাধ। ব্যক্তির স্বানুভূতির মধ্যে সমাজশক্তির প্রভাবে এই পাপ ও পুণ্যের বোধ বিবেকরূপে জাগ্রত রহিয়াছে। কাণ্ট্ এই বাণীকে কেবলমাত্র সত্যের বাণীরূপে বুঝিয়াছিলেন।

৬৬—৮০ পৃষ্ঠা।

ফরাসীবিপ্লবের সময় যতক্ষণ রাজশক্তিকে শুধু ধ্বংস করা হইয়াছিল মাত্র ততক্ষণ ব্যক্তি স্বাধীন হইতে পারে নাই। ব্যক্তি তখনই স্বাধীন হইল যখন "সোসিয়লজির" প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তি ব্যক্তি শক্তির মধ্যে অবতীর্ণ হইল—এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে সত্যকে আনিবার চেষ্টা, লক্, হিউম প্রভৃতির দার্শনিক মতেও দেখা যায়;—তবে কাণ্টের মধ্যেই ইহার স্ফুটতম প্রকাশ—ব্যক্তিত্বের মধ্যে সত্যকে

ভূমিকা।

সত্যাঃ সদ্‌গুরুবাক্‌সুধাশ্রুতিপরিস্ফীতশ্রুতীনম্বিবো
নালং তোষয়িতুং পয়োদপয়সা নাম্ভোনিধিস্ত্ প্যতি।
ব্যাখ্যাভাসরসপ্রকাশনমিদং ত্বস্মিন্‌ যদি প্রাপ্যতে
ক্বাপি ক্বাপি কণো গুণস্য তদসৌ কর্ণে ক্ষণং দীয়তাম্‌॥

বহুদিন পূর্ব্বে একখানি পুস্তকের পূর্ব্বাভাস-স্বরূপ এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। নানা কারণে মূল পুস্তকখানি শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। সেই জন্য এই পূর্ব্বাভাসটিই স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম। তত্ত্ব সম্বন্ধে এত ক্ষুদ্র পুস্তকে যতটুকু আলোচনা হইতে পারে তাহা অতি সামান্য। সেই জন্য ইহার নাম তত্ত্বকথা দিয়া লজ্জাবোধ করিতেছি।

অল্প পরিসরের মধ্যে চলিত কথায় অনেক কঠিন বিষয়ের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যথা-সম্ভব পারিভাষিক শব্দ বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছি জানিনা। দার্শনিক তথ্যের, কেবল মাত্র আভাস দিতেই চেষ্টা করিয়াছি। বিচার

করিবার উদ্যোগ করি নাই। অনেক স্খলন, পতন, ত্রুটি যে রহিয়া গিয়াছে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কতকগুলি মুদ্রাকর প্রমাদও স্থানে স্থানে অসংশোধিত অবস্থায় রহিয়া গেল। তথাপি কোনও স্থানে কোনও গুণ পাইয়া যদি গুণগ্রাহি পাঠকেরা ইহার প্রতি বিন্দুমাত্রও আকৃষ্ট হন তাহা হইলে আনন্দিত হইব।

গ্রন্থকার।

বস্তুসঙ্ক্ষেপ।

বহু লোকের অবিসংবাদি ও বাধবিহীন প্রত্যক্ষের নাম সত্য। প্রত্যক্ষ সম্ভব না হইলে যুক্তি দ্বারা সত্য নির্ণয় করা হয়—স্ববিরোধ পরিহারই যুক্তির ভিত্তি—কি হিসাবে পরিণামের মধ্যে একটা আপাত স্ববিরোধ দেখা যায়—তাহার পরিহার—পরিণতির ক্রমে ও অনন্ত ভেদে বিরাট হইতে ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত ক্রমবিস্তার—ভেদের মধ্যে অভেদ—অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমস্ত আপাতপৃথক্ বস্তুগুলি পরস্পর সংযুক্ত—এই সংযোগের প্রণালী বাহির করিয়া ব্যাপকের মধ্যে ব্যাপ্যকে প্রতিষ্ঠিত ভাবে দেখাই যুক্তির উদ্দেশ্য—ব্যাপ্যের সম্বিৎ ব্যাপকের সম্বিতের মধ্যে নিহিত—ব্যাপ্যের মধ্যে ব্যাপকেরই আত্মপরিণতি দেখা যায়—নানা সম্বন্ধের মধ্য দিয়া নানা সম্বিতের পরিস্ফূর্ত্তিই জ্ঞান—এবং সম্বিতের সহিত সম্বিতের সম্বন্ধ নির্ণই যুক্তির কায—বিরাট্ই নানা ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে—অসীম সসীমের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

১—১৬ পৃষ্ঠা।

বৃহতের শক্তিতেই ক্ষুদ্র শক্তিশালী—পরম বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রতম পর্য্যন্ত এক শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত—সেই জন্য ক্ষুদ্রতমেরও নিয়ম ও শক্তিকে অতিক্রম করিলেই বিশ্বের বিধানে দণ্ডের বিধান—সত্যের কোনও মূর্ত্তিকে যে ভাবেই আমরা অস্বীকার করি না কেন তাহাতেই দণ্ডবিধান অবশ্যম্ভাবী।

১৬—২৫ পৃষ্ঠা।

বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরা কেবল জ্ঞানকে স্বীকার করিতেন—তাঁহারা বলিতেন জ্ঞানই একমাত্র অব্যভিচারী বস্তু—আকারগুলি ব্যভিচারি, কাজেই মিথ্যা—জ্ঞান ছাড়া যখন জড়ের স্বতন্ত্র প্রকাশ নাই তখন সেগুলি সত্য নয়—নেতি নেতি করিয়া আমরা "সত্যং জ্ঞানং" পাই—সেইটিই একমাত্র সত্য বস্তু—তাঁহারা সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে সত্য বুঝিয়াছিলেন বলিয়া আর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই দিকে ছুটিয়াছিলেন—কিন্তু সত্যের এইরূপ সীমা নির্ণয় অসম্ভব—তাঁরা ব্রহ্মকে বিশুদ্ধ নিরাকার জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন তাই জ্ঞানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ আকারের কোনও কারণ দিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন যে তাহার কারণ "অবিদ্যা" অর্থাৎ

তত্ত্ব কথা।

সত্য বলিলেই সাধারণতঃ বুঝায় এই যে যাহা বাস্তবিক আছে বা ছিল এবং থাকিবে। যখন পরস্পরের মধ্যে বাদ প্রতিবাদ হয় তখন একে অপরকে বলে আমার কথাই সত্য; বিশ্বাস না হয় চল দেখাইয়া দিতেছি; না হয় আরও দশজন লোক লইয়া আইস; যদি দেখাইবার যোগ্যও না হয় তবে সে আরও দশজন লোকের কথা বলে; রাম বাবু দেখিয়াছেন; শ্যাম বাবু দেখিয়াছেন; যদু ও কানাই কাঙ্গিলালও দেখিয়াছে; ইহা মানিবে না কেন, অর্থাৎ দশজনে দেখিয়াছে দশজনে স্পর্শ করিয়াছে, উপলাভ করিয়াছে ইহা দেখাইয়া দিয়া বস্তুটির সত্তা সম্বন্ধে যে সংশয় আসিয়াছিল তাহা দূর করিয়া দেয় এবং সেই সঙ্গেই সেই সত্তাকেও প্রমাণ করিয়া দেয়। আর যে সমস্ত স্থলে দেখাইয়া বা লোকের কথার দোহাই

দিয়া প্রমাণ করা চলে না সেখানে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করে। যুক্তি জিনিষটা কি তাহা যদি চিন্তা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে তাহা যে একটি স্বতন্ত্র উপায় বা উপাদান তাহা নহে; কথাটা খুব জমকাল রকমের শুনাইলেও তাহার উপায়টা খুবই স্বাভাবিক সরল এবং সহজ। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোধ হয় বুঝিতে পারা যায় যে এটা একটা সাদা কথা যে কোনও একটা বস্তু এবং তাহার উল্টাটা স্থিরভাবে কখনও একত্র থাকিতে পারে না। অর্থাৎ একই বস্তু একই সময়ে তাহার উল্টা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। উল্টা বলিতে আমি ইহা বুঝিনা যে একেবারে কলের ছাঁচে ফেলিয়া কোনও জিনিষের উল্টা করিয়া লওয়ার কথা বলিতেছি; যে কোনও প্রকারে অন্যবিধ বা অন্য প্রকারের হইলেই চলিতে পারে। স্থূলকথা এই যে, কোনও বস্তু একক্ষণে যা থাকে সে তাহাই থাকে; অর্থাৎ একই ক্ষণে একই বস্তুকে গৌর বলিলে, সেইক্ষণেই তাহাকে ঠিক সেইভাবেই কৃষ্ণ বলা চলে না। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে, যে

কোনও একটি বস্তু যখন আছে তখন সে যেরূপ সিদ্ধ, নিষ্পন্ন, নানা বিশেষণে তাহার সত্তাটি যে ভাবে বিশেষিত, ঠিক সেইভাবের বিশেষিত সত্তা লইয়াই আর একটি বস্তু কখনই সেইক্ষণে থাকিতে পারে না।

কথাটি সহজ হইলেও আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে বড়ই কঠিন। আজ এই মুহূর্ত্তে যে বীজটি মাটিতে প্রোথিত করিলাম; ঠিক দশ বৎসর পরে হয় ত দেখিব যে সেখানে একটি প্রকাণ্ড মহীরুহ হইয়াছে; আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে এই প্রকাণ্ড মহীরুহটি কোথা হইতে আসিল; অন্যস্থান হইতে কেহ আনিয়া লাগায় নাই তবে এ কোথা হইতে আসিল; তবে কি যে সময় বীজ মাটিতে পুঁতিয়াছিলাম সে সময়ও এই গাছটি ছিল; কৈ তখনত গাছ দেখি নাই; তখনত কেবলমাত্র বীজই দেখা গিয়াছিল, তবে কি বীজ এবং গাছ একই জিনিষ; কৈ তাহা হইলে ত মিল হইতেছে না; একই সময়ে একই বস্তুর সত্তা ভিন্ন প্রকারের কিরূপে হইবে? অথচ ইহা অস্বীকার করাও যায় না।

কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে বীজের সত্তাটি যেরূপ, সেই একই ক্ষণে বৃক্ষের সত্তাটিত সেরূপ নহে। বীজ এবং বৃক্ষ একবারে পৃথক, অথচ বীজ এবং বৃক্ষ একই বস্তু ; এই বীজই কালে বৃক্ষ হইয়া প্রকাশ পাইবে কিন্তু তাহা হইলেও একথা বলা চলে না যে যখন বীজটি পুঁতিলাম তখন সেই বীজটির সহিত তাহারই আত্মস্বরূপ বৃক্ষের কোনও পার্থক্য নাই ; যদি কোনও পার্থক্য না থাকিত তবে বীজ পুঁতিবার সময় বীজটিও যেমন দেখিতাম গাছটিও তেমন দেখিতাম, আর বীজ পুঁতিবার আবশ্যক থাকিত না ; তবেই বীজ এবং বৃক্ষ এক হইলেও একটু পার্থক্য আছে।

একের সত্তা ঠিক অপরের সত্তা নহে ; বীজকে বৃক্ষের সূক্ষ্মাবস্থা বলা যাইতে পারে ; এই বীজই কালে জল বায়ু আকাশ আলোর স্পর্শে ক্রমশঃ বৃক্ষ হইতে থাকিবে ; তবেই বীজাবস্থায় বীজকে যেভাবে বীজ বলা যাইতে পারে ঠিক সে ভাবে তাহাকে বৃক্ষ বলা যাইতে পারে না। কাজেই এ স্থলে একেবারে তত্ত্ব কথার দিকে গেলেও একথা বলা যাইতে পারে

না, যে বীজসত্তা এবং বৃক্ষসত্তা একেবারে একই জিনিষ; তাই একথা বেশ বলা যায় যে একই সময়ে কোনও দুইটি জিনিষকেই একেবারে এক বলা যাইতে পারে না; অতএব যদি কোনও বস্তুর সত্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আমরা তাহাকে ঠিক স্পষ্ট না দেখিতে পাই অথবা তাহা যদি দেখার যোগ্য না হয় তবে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে তাহার বিপরীতটি সেখানে আছে কিনা; যদি বিপরীতটির থাকিবার সম্ভাবনাও থাকে তথাপিও আমরা পূর্ব্বেরটির সত্যতা সম্বন্ধে নিসংশয় হইতে পারি না। বিশ্ববিধানের এমনই বিচিত্র নিয়ম যে স্থানভেদে, অবস্থা ভেদে, প্রকার ভেদে এবং সময় ভেদে সমস্ত বস্তুই বিচিত্র। এমন দুইটি বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যাহারা পরস্পর সমান। সকল বস্তুই বিচিত্র। আবার সকল বস্তুই এক।

যেখানে যাও সেইখানেই দেখিবে কেবল বিচিত্রতা। এমন দুইটি জিনিষ পাইবে না যাহারা পরস্পর এক। একই বৃক্ষের একটি পল্লবের দুইটি পত্র লইয়া দেখ দেখি কত পার্থক্য, দেখ

দেখি ঠিক একই রকমের দুইটি ফল পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাও কিনা ; জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণী-জগৎ খুঁজিয়া দেখ দেখিবে, প্রত্যেকটিই প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র। অথচ কোনওটিই কোনওটি হইতে একেবারে পৃথক্ নয়। এই তত্ত্বটির উপরেই Leibnitzএর "Principium Indiscernibilium" এর সুত্রটি প্রতিষ্ঠিত এবং এই জন্যই, কি পদার্থতত্ত্ব, কি ভূতত্ত্ব, কি নৃতত্ত্ব, কোনও বিভাগেই অলঙ্ঘ্য শ্রেণী বিভাগ সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে একটি বিভাগ অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একে-বারে এক বলিতেও কিছু নাই একেবারে পৃথক্ বলিতেও কিছু নাই। একেরই যেন স্তরে স্তরে ক্রম বিকাশ। "Could we restore all the ranks of the great processions that have descended from the common ancestor, we should find nowhere a greater difference than between off-spring and parents ; and the appear-ance of Kinds existing in nature which is so striking in a museum would

entirely vanish. Could we begin at the beginning and follow this development down the course of time, we should find no classes but an ever-moving, changing, spreading, branching continuum."* অভেদের দিক্ দিয়া দেখিলে সবই যেমন অভিন্ন, ভেদের দিকে দেখিলে সবই তেমনি বিভিন্ন। একদিকে যেমন অদ্বৈত অপর দিকে তেমনি বহুধা বিচিত্র।

এত বিচিত্রতা সত্ত্বেও সেই জন্যই এই ভিন্ন বস্তুগুলির মধ্যে কি প্রগাঢ় সম্বন্ধ। সামান্য ঘাসটি পাতাটি পর্য্যন্ত পরম্পরা সম্বন্ধে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ; সব যেন একেবারে সাজান, যেন এক সঙ্গে গাঁথা; কাহাকেও ছাড়িয়া কাহারও থাকিবার উপায় নাই; তোমার হাতের নাটায়েতে একটুখানি টান পড়িলে আস্‌মানের ঘুড়ি শুদ্ধ কাঁপিয়া উঠিবে। যে যেখানে সে তখন সেইখানেই ঠিক, তুমি না দেখ্‌তে পাইলে কি হয় বিশ্বের সকল বস্তুর সহিত তাহার পরতে পরতে, নাড়ীতে নাড়ীতে, প্রাণে প্রাণে যোগ; এই

যোগ এই সম্বন্ধ যোজনা করাকেই যুক্তি বলে। যখন বস্তুটি আমরা ইচ্ছা করিলেই ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি ; তখন না হয় কোনও রূপে দেখিয়া বা স্পর্শ করিয়া সেই বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি রকমে স্থির করিতে পারিলাম কিন্তু যাহা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারিব না তাহার বেলা কি করিব, তখন কি করিয়া বস্তুর সত্যতা নির্দ্ধারণ করিব। তাই পণ্ডিতেরা বলেন যে তখন যোজনা বা যুক্তি করিব। যখন সমস্তই পরস্পর গাঢ় সম্বন্ধে অন্বিত তখনত আর ভয়ের কোনও কারণ নাই।

যতটুকুর সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত সেই-খান হইতে ধীরে ধীরে রওনা হইয়া আসিলেই অর্থাৎ যেটুকুকে আমরা সত্য বলিয়া জানি সেটাকে এক হাতে রাখিয়া তাহার নানা সম্বন্ধের মধ্যে যে কোনও একটা অভিমত সম্বন্ধ ধরিয়া চলিয়া আসিলেই আমরা আর একটি বস্তুতে আসিয়া পৌঁছিব। যোজনা করিয়া দেখিব, অন্যবিধ সম্বন্ধের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব যে পূর্ব্বের যোজনা বা যুক্তিতে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই পাওয়া

যায়, না অন্য আর কোনও বস্তুও পাওয়া যায়। যদি উভয় দিকে ঠিক মিল হয় এবং একই সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় তবে বুঝা গেল যে বস্তুটির সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে নচেৎ বুঝিতে হইবে যে যোজনার কোথাও নিশ্চয় ভুল হইয়াছে; সম্বন্ধগুলিকে ঠিক হয় ত ধরিতে পারা যায় নাই কিম্বা তাহাদের পর্য্যালোচনা হয় ত ঠিক হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম ধরা যাউক কোনওরূপে ডিম্ব প্রসবকারিণীদিগের সহিত যাহারা গিলিয়া আহার করে তাহাদের সহিত এই সম্বন্ধ বাহির করা গেল, যে যাহারা গিলিয়া খায় তাহারা সকলেই ডিম্ব প্রসব করে। এখন যদি আমি ডিম্ব প্রসব করার সহিত কুমীরের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা তাহার বিচার করিতে যাই তবে আমাকে দেখিতে হইবে যে ডিম্ব প্রসবের সহিত সম্বন্ধ আছে এমন আর কোনও একটা বস্তু পাই কিনা, তখন দেখিলাম যে আমি জানি যে গিলিয়া খাওয়ার সহিত ডিম্ব প্রসবের একটা সম্বন্ধ আছে এবং যাহারা গিলিয়া খায় তাহারা সকলেই ডিম্ব প্রসব করে; এখন আমাকে দেখিতে হইবে যে এই গিলিয়া খাওয়ার সহিত ডিম্ব প্রসবের যেরূপ

সম্বন্ধ, গিলিয়া খাওয়ার সহিত কুমীরের ঠিক সেরূপ কোনও সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না; অর্থাৎ কুমীর গিলিয়া খায় কিনা? কিছুই ঠিক করিতে পারি না। কুমীর গিলিয়া খায় না চিবাইয়া খায় কে জানে। তাহাকে যেমন ডিম পাড়িতেও আমরা দেখি নাই তেমনি গিলিয়া খাইতেও আমরা দেখি নাই যিনি পৈত্রিক প্রাণের বিনিময়ে তাহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন তিনিও বলিতে আসিতে পারেন নাই; তবে এখন দেখিতে হইবে যে গিলিয়া খাওয়ার সহিত আর কিছুর কোনও সম্বন্ধ বাহির করা যায় কিনা, এবং সেটা কুমীরের পাওয়া যায় কি না; দেখিতে দেখিতে দেখিলাম যে যাহাদের গালাসীর দাঁত নাই তাহারাই গিলিয়া খায়, এখন আমার দেখিতে হইবে যে যাহাদের গালাসীর দাঁত নাই তাহাদের সহিত কুমীরের একটা ঐরূপ সম্বন্ধ পাওয়া যায় কি না। দেখিলাম যে বাস্তবিক পক্ষে কুমীরের গালাসীর দাঁত নাই, তখনএই সম্বন্ধ পরম্পরার মধ্য দিয়া আমি অনায়াসে অনুমান করিতে পারিলাম যে কুমীরও ডিম পাড়ে। এইখানেই Immediate ও Mediate inference এর ক্ষেত্র।

ইহার মধ্যে কাহার মনে হইতে পারে যে সত্য কি তাহা বলিতে গিয়া বস্তু সত্তা মাত্রই প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলাম এখন আবার অতিরিক্ত একটি সম্বন্ধ পদার্থ আনিতেছি কোথা হইতে? কিন্তু তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমরা যখন কোনও বিষয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হই তখন আমরা কোনও সম্বন্ধ বিশেষের মধ্য দিয়াই তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি। বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ সংস্থাপনকেই জ্ঞান বলা যায় কাজেই আমাদের পক্ষে কোনও বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে তাহা বস্তু বিশেষের সহিত সম্বন্ধটাকেই লক্ষ্য করিতেছে। একেবারে সম্বন্ধ বিহীন কোনও বস্তুর বিষয় আমরা জিজ্ঞাসাই করি না। সম্বন্ধ যেখানে নাই সেখানে আমাদের জ্ঞানও নাই। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কোনও না কোন সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তবেই দেখা যাইতেছে যে সংসারের একটি বস্তুর সহিত আর একটি সম্বন্ধ এবং তাহার সহিত আর একটি সম্বন্ধ এবং এইরূপে সংসারের সমস্ত বস্তুই পরস্পর গাঢ় ভাবে

সম্বন্ধ। যদি কোনটির সহিত কোনটির সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ না বুঝিতে পারা যায় তবে অপরের সহিত যোজনা করিয়া প্রার্থিত সম্বন্ধটি অনায়াসেই লাভ করিতে পারি। ডিম্ব প্রসবের সহিত কুমীরের সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না বলিয়াই ডিম্ব প্রসবের সহিত গিলিয়া খাওয়ার এবং গিলিয়া খাওয়ার সহিত গালাসীর দাঁতের এবং গালাসীর দাঁতের সহিত কুমীরের তুল্য সম্বন্ধ আছে জানিয়া আমি অনায়াসেই সম্বন্ধগুলিকে যোজনা করিয়া প্রস্তাবিত ডিম্ব প্রসব ব্যাপারের সহিত কুমীরের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারিলাম।

তবে এই সম্বন্ধগুলি পর্য্যালোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে যখন আমরা প্রথম কোনও একটি সম্বন্ধ হইতে দ্বিতীয় আর একটি সম্বন্ধে আসিয়া দাঁড়াই অর্থাৎ প্রথম সম্বন্ধটির দ্বারা যখন দ্বিতীয় সম্বন্ধটির যোজনা করিলাম তখন এই যে আমার যোজিত দ্বিতীয় সম্বন্ধটি, এটি ঠিক হইল কিনা? এবং তাহা বুঝিতে হইলে আমাকে এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আমি আমার নূতনলব্ধ সম্বন্ধজ্ঞান হইতে যোজনা করিয়া আবার প্রথমকার

সম্বন্ধটি পাইতে পারি কিনা ; কারণ প্রথম সম্বন্ধটি হইতে যোজনা করিয়া যদি দ্বিতীয় সম্বন্ধটিতে ঠিকমত আসিয়া থাকি তবে দ্বিতীয় সম্বন্ধটি হইতেও যোজনা করিয়া প্রথম সম্বন্ধটিতে আসিতে পারিব কারণ তাহারা ত পরস্পর সম্বন্ধই রহিয়াছে কাজেই একটা হইতে আর একটায় আসিতে পারিলে আর একটা হইতেও পূর্ব্বেরটায় যাওয়া যাইতে পারিবে।

আর যদি দেখি যে দ্বিতীয়টি হইতে যোজনা করিতে গেলে ঠিক প্রথমটি হইতেও পারে বা নাও হইতে পারে অথবা বাস্তবিকই আর একটাই হইয়া পড়ে তবে বুঝিতে হইবে যে আমার যোজনা করা ঠিক হয় নাই কারণ একই বস্তু কখনও একই ক্ষণে তাহার বিপরীতটি হইতে পারে না। আরও স্পষ্ট করিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে যে যোজনা দ্বারা যে দ্বিতীয় যোজনাটীতে আসিলাম সেটি যেন প্রথম জ্ঞানটির বিরোধী না হয় ; যদি বিরোধী না হয় তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে প্রথম জ্ঞানটির মধ্যেই তাহা নিহিত ছিল এবং প্রথম সম্বন্ধটি ছাড়া তাহা

মূলতঃ আর কোনও স্বতন্ত্র সম্বন্ধ জ্ঞান নহে। যখন বলিলাম যে, বিনা চর্ব্বণে ভক্ষণকারিরা ডিম্ব প্রসব করে; কুমীর বিনা চর্ব্বণে ভক্ষণকারী; অতএব কুমীর ডিম্ব প্রসব করে। এখানে যখনই আমি বলিয়াছি যে সমস্ত বিনা চর্ব্বণে ভক্ষণকারিরা ডিম্ব প্রসব করে, তখনই কুমীরের ডিম্ব প্রসব কারিত্বটা একরূপ তাহারই মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু তথাপিও কুমীর সম্বন্ধে আমার ঐ জ্ঞানটা ছিল না তাই কুমীরের বিনা চর্ব্বণে ভক্ষণকারিত্ব সম্বন্ধের মধ্য দিয়া আমি কুমীরের ডিম্ব প্রসব-কারিত্ব গুণটির উপলব্ধি করিলাম; যে বিরাট সম্বন্ধটা কুমীরের মধ্যেও পড়িয়াছিল সে যেন আমার নিকট তিরোহিত হইয়াছিল তাই তাহাকে আমি পুনরায় যোজনা করিয়া ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া তাহাকে লাভ করিলাম; এই যে দ্বিতীয় উপলাভ সেটি প্রথমটি হইতে স্বতন্ত্র নহে কাজেই সেটি প্রথমটির বিরোধী নহে; অপেক্ষাকৃত ব্যাপকের মধ্যে যাহা ছিল ব্যাপ্যের মধ্য দিয়া তাহাই ফুটিয়াছিল; আমি চক্ষুতে তাহা দেখিতে পাই নাই; যোজনা করিয়া বুঝিলাম। আমরা যখন এই

গতিরোধ করিবে, তুমি একটীকেও অন্যথা করিতে পার না, বা একটীকেও তাহার স্থান হইতে অন্যত্র সরাইতে পার না; একটী অতি ক্ষুদ্রকেও সরাইতে গেলে সমস্ত বিশ্ব তোমার গতিরোধ করিতে আসিবে।

একটি ক্ষুদ্রকে সরাইয়া তাহার স্থানে যখন আর একটি ক্ষুদ্রকে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছ অথবা তাহাকে অন্যথা করিতে চেষ্টা করিয়াছ তখনই দেখিবে বৃহতে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে এবং বৃহৎ নিজেই অন্যথা হইতে চলিয়াছে; কারণ ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া ত বৃহতেরই জীবন ফুটিয়া উঠিতে ছিল, কাজেই ক্ষুদ্রের জীবন অন্যথা করিতে গেলে বৃহতেরও জীবন অন্যথা হইয়া পড়িতে চায়, এবং সেই সঙ্গে তদপেক্ষা বৃহৎ, তদপেক্ষা বৃহৎ, এই ক্রমে মহানের সমস্ত অবয়বই যেন কাঁপিয়া উঠিতে থাকে। তাই এক জায়গায় সত্যের অপলাপ করিতে চলিলে সমস্ত বিশ্বের সত্য আসিয়া তোমার অলক্ষ্যে পথ রোধ করিয়া দাড়াইবে। যিনি মহান্, যিনি ভূমা, তিনি ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিয়া একেবারে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষোদীয়ানে উপস্থিত হইয়াছেন। বরাবর ধারাবাহিক শৃঙ্খলা, এবং সমস্ত শৃঙ্খলাই তাঁর মহত্ত্ব

কীর্ত্তন করিতেছে। যদি তিনি তাঁহাকে কেবল তাঁহার বৃহতের মধ্যেই চাহিতেন, তবে আর ক্ষুদ্রের কোনও প্রয়োজনই থাকিত না, তাঁহার অনন্তের মধ্যেই যদি তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন তাহা হইলে সেইখানেই তাঁহার অনন্তত্ব নষ্ট হইয়া যাইত তাই তিনি সকল ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে করিতে এই জগতের পরম বিচিত্রতার সৃজন করিয়াছেন; আমরা কিন্তু অনেক সময়েই তাঁর এই বিচিত্র প্রেম ঠিক পাই না। তিনিই ক্ষুদ্র হইয়াছেন, তিনিই আমার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া বাঁশী বাজাইয়াছেন ইহা ঠিক পাইলেও তিনি যে কোন্ পথে আসিয়াছেন তাহা ঠিক পাই না; তাই যখন তাঁহাকে আমরা দ্বারপ্রান্তে পাই তখনই গ্রহণ করিতে পারি, নচেৎ আমরা ইচ্ছামত যে তাঁহাকে খুজিয়া পাইব তাহার আর উপায় থাকে না। কাজেই তাঁহার সহিত সুখমিলন আমার অধীন না হইয়া তাঁহারই আয়ত্ত হইয়া থাকে; আমার কাজ বুঝিয়া, আমার ব্যগ্রতা দেখিয়া, আমার আবেগ দেখিয়া, তিনি আজ একুঞ্জে, কাল ওকুঞ্জে, দেখা দেন বটে কিন্তু এই কুঞ্জরাজির মধ্য দিয়া তাঁহার

প্রচ্ছন্ন সঞ্চার ভূমিটা চিরগোপনই রহিয়া যায়; আমি হয় ত এক স্থানে পাইয়াই ভাবি যে এইখানেই বুঝি তাঁর আরাম, তিনি বুঝি এইখানেই মাত্র থাকেন।

তখন অমনি তিনি আর এক কুঞ্জ হইতে বাঁশী বাজাইয়া উঠেন, আর ভক্ত বৈজ্ঞানিকেরা উদ্বেলিত হৃদয়ে, অসম্বৃত বসন ভূষণে, নগ্নপদে তাঁহার উদ্দেশে ছুটিতে থাকেন। তিনি তাঁহার ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে নিজেই আড়াল তুলিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই আড়ালের ভিতর দিয়া আনা গোনা করিতেছেন। আমরা কখনও যমুনা তটে কখনও বংশীবটে কখনও বা মাধবীকুঞ্জে কখনও বা শ্যামকুঞ্জে কখনও বা দূরে কখনও বা সন্নিকটে তাঁহাকে দেখিতেছি, কিন্তু তিনি যে এক সময়েই সকল কুঞ্জে সঞ্চার করিতেছেন, ষোল শত গোপিনীর সহিত যে একই নিশায় বিহার করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারি না। যেখানে আমরা থাকি তাহারই চারিদিকের আড়ালে আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া রাখে অথচ সেই আড়ালের মধ্য দিয়াই তিনি তাঁহার গোপন মিলন সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। প্রাণ চায় যে, যেন সকল বাধা

টুটিয়া যায়, যেন সকল কুঞ্জের আড়াল ছুটিয়া যায়; কিন্তু তাহা হইলে যে কুঞ্জই থাকে না। তিনি যে জানেন গোপনমিলনের কত মধুর স্বাদ, প্রেমের কত লীলা বৈচিত্র! রসিক তিনি, তাই তিনি তাঁহার অবাধ সঞ্চার আমাকে দেখান না, তাই আমি অনিমেষনেত্রে, পুলকিত গাত্রে তাঁর বিশ্বসঞ্চার দেখিতে পাই না। যখন আমার ক্ষুদ্র কুঞ্জে তিনি আসেন তখনই তাঁহাকে পাই, তাঁর সকল স্থানের অবাধ পদ সঞ্চার, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তাঁর পদ সংক্রমণ উপলাভ করিতে পারি না; তাই আমরা যদিও কোনও একটি বৃহৎকে, কোনও একটি ক্ষুদ্রের মধ্যে উপলাভ করি তথাপিও সেই বৃহৎ হইতে বৃহত্তরকে সেই বৃহতের মধ্যে, এবং বৃহত্তর হইতে বৃহত্তমকে বৃহত্তরের মধ্যে, এবং এই ক্রমে একেবারে ভূমা এবং মহান্ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারি নাই। সকল পথের সম্বন্ধ জানি না। সকল কুঞ্জ হইতে আগম নির্গমের পন্থাও বুঝি না। তিনি আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাই সমস্তই সত্যের অবয়ব এবং সত্য। তাই কোনও সত্যকে যদি অপলাপ

করি তবে সমস্ত বিশ্ব আমাকে রুধিয়া দাঁড়ায়। সত্যকে আমি যে ভাবেই অবহেলা করি না, কেন তাহার দণ্ড আমাকে তখনই পাইতে হইবে। ভুলে হউক, ইচ্ছায় হউক, যে ভাবেই আমি সত্যকে অবহেলা করিব সত্য সেই ভাবেই আমার গতিরোধ করিবে এবং আমাকে দণ্ড পাইতে হইবে; ভুলে করিয়াছি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়াছি তিনি তাহা গণনা করিবেন না।

যেভাবেই তাঁহার গতিরোধ করি না কেন, তিনি আমার গতিরোধ করিবেন, তাই প্রাচীনেরা বলিয়াছেন যে জ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক পাপ করিলেই তাহার সাজা আছে। আমার সম্মুখে অগ্নি আছে কিন্তু আমি যদি তাহা না জানি এবং না জানিয়াই যদি সেই অগ্নি না থাকিলে যেরূপ ব্যবহার করিতাম সেইরূপ ব্যবহার করি এবং এইভাবে সত্যকে অবহেলা করি তবে সত্য তাহা শুনিবে না; জানিয়াই হাত দেই আর না জানিয়াই হাত দেই আগুন হাত পুড়াইবেই পুড়াইবে; সে নাই ভাবিয়া আমি তাহাকে অবহেলা করিলাম বটে কিন্তু তাই বলিয়া সত্য

তাহাতে অবজ্ঞাত হইবে না; তিনি তাহার প্রবল দাহিকা শক্তিদ্বারা জানাইয়া দিবেন যে তিনি সেইখানে আছেন তাঁহাকে অবজ্ঞা করার কোনও অধিকার আমার নাই। সে দাহিকা শক্তি তাহার নিজস্ব নয়, সমগ্র বিশ্বের হইয়া সে শক্তি কাজ করিতেছে; সে শক্তি সমস্ত বিশ্ব-নিয়মের দূত, সে শক্তি উল্টাইলে সমস্ত বিশ্বের শক্তিই উল্টাইয়া যাইবে তাই সে শক্তি এত অপ্রতিহত, তাই তাহাকে অন্যথা করা কঠিন; আমি অগ্নিকে অস্বীকার করিতে গেলে সে তাহার দাহিকা শক্তিদ্বারা আমাকে আক্রমণ করিবে।

কারণ এক অগ্নি অস্বীকার করাতেই আমি সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক নিয়ম এবং শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করিলাম তাই সে যেন বিশ্বের প্রতিনিধি হয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে। তার বল কত, সে বিশ্বের প্রতিনিধি, তার শক্তি অপার। সমস্ত বিশ্বের গিরিদুর্গ তার পিছনে। তার ভয় কি? তাই বলিতেছিলাম যে, সত্যকে প্রতিরোধ করিতে গেলে তার সাজা ঠিক আসবেই আসবে। সত্যকে আমি যে ভাবেই অস্বীকার করি

না কেন সে আমাকে সেই ভাবেই বাধা দিবে এবং সেই ভাবেই আমাকে স্বীকার করিয়ে নেবে। যেদিক্ দিয়াই আমি সত্যকে "না" বল্‌তে যাব সে সেই দিক্ দিয়াই ডেকে বলে উঠ্‌বে যে সে "না" নয়, সে "হাঁ"। যখন চিন্তায় আমি কোনও সত্যকে অস্বীকার করি, তখনই আমার চিন্তার মধ্যে তোলাপাড়া উপস্থিত হয় এবং সত্যকে অস্বীকার করার জন্য আমার চিন্তার খেই মিলিয়ে ঠিক্ করে উঠ্‌তে পারি না। আমার কেবলই ভুল হইতে থাকে। যে সত্যকে অস্বীকার করিতেছিলাম সেই সত্যকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এনে তার সিংহাসনে বসাব ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার চিন্তারাজ্যের বিপ্লব মিটিবে না। কবি গাহিয়াছিলেন "যদি কোনও দিন তোমার আসনে, আর কাহারেও বসাই যতনে, চির-দিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেও না প্রভু"। তা তিনি ফিরিয়া যান না, তিনি রাজ্যের মধ্যে চারিদিকে বিপ্লব বাধাইয়া দেন। চারিদিকে অশান্তির সৃষ্টি করেন এবং সকল বিরোধ এবং অশান্তির মধ্যে নিজের সিংহাসনে নিজকে

প্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার সর্ব্বত্র মঙ্গলময় শান্তির বার্ত্তা প্রচার করেন; এইরূপ যখন জড়ের মধ্যে সত্যকে অস্বীকার করিবে, তখন জড়ের দিক্ হইতেই বাধা আসিবে, তা জানিয়াই অস্বীকার কর আর না জানিয়াই অস্বীকার কর। রাজাকে না মানিলে তার সাজা আছেই; যদি বল আমি জানিতাম না যে তুমি রাজা, রাজা বলিবে আচ্ছা তাইত তোমাকে জানাইয়া দিতেছি। কে আছরে পাইক্ পেয়াদা! হাত পা বেঁধে পঁচিশ ঘা করে বেত মেরে একে বুঝিয়ে দে যে আমি রাজা। বেত খেলেই সে বোঝে, যে, না, একে অস্বীকার করা চলে না। একে অস্বীকার কর্‌লে এ বুঝিয়ে দিবে, এ জানিয়ে দেবে, মানিয়ে নেবে, যে এ রাজা। তখন সে বলে যে না তুমিই রাজা। আবার যখনই না মান্‌বে তখনই রাজশাসন উপস্থিত হবে। গ্রীষ্মের রোদ যদি তুমি না মেনে বিনে ছাতায় ইচ্ছামত খুব ঘুরিয়া ফিরিয়া আস, তবে তখনই বাড়ীতে মাথা ধরিয়া শুইয়া পড়িয়া থাকিবে। শীতের রাতের শীতল বায়ু না মেনে শুধু গায় জানালা খুলে শুয়ে থাক্‌লে তার পর দিনই

সকাল বেলা আদা সৈন্ধবের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। আপাততঃ যখন মনে হইবে যে বুঝি অসুখ কর্‌ল না, তখন তুমি টের পাও নাই বটে; কারণ স্পষ্টতঃ বেত্রদণ্ড না হইলে তুমি টের পাইবার ছেলে নও; কিন্তু কিছুদিন পরেই হয় ত দেখিবে যে যত দিনের ইজারা ছিল তার পূর্ব্বেই তোমার বসত বাড়ীর উপর ক্রোকী পরোয়ানা আসিয়া উপস্থিত হইল। তুমি টেরও পাইলে না, যে কেন ক্রোকী পরোয়ানা এত হঠাৎ আসিল, কারণ কত দিনের ইজারা ছিল তাহা তোমার একেবারেই জানা ছিল না, তাহা রাজ বাড়ীর পাকা খাতায় লেখা ছিল, তোমার সাজা স্বরূপে রাজার হুকুমে মুহুরি তার থেকে কিছু তোমাকে কমিয়ে দিলে। যে ভাবেই তুমি সত্যকে অস্বীকার কর না কেন তাতেই তোমার পাপ জন্মাবে এবং তাতেই তোমাকে সাজা পেতে হবে। পূর্ব্বতন বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদিরা সত্যকে জ্ঞানের মধ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু জড়কে জ্ঞানের বাহিরে বলে মনে করতেন, তাঁরা ভাবতেন যে জ্ঞানই কেবল মাত্র সত্য এবং তার এত যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের রূপ তা সবই মিথ্যা। জ্ঞানের উপর

সব জিনিষ কল্পিত হচ্চে এবং যে গুলি কল্পিত, সে গুলিকে সত্য বলা চলে না। জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই আমরা পাই না, তাই জ্ঞান ছাড়া আর কিছু স্বীকারও করা চলে না।

তুমি মনে কচ্চ তোমার সাম্‌নে একটা গাছ আছে, কিন্তু গাছ বল্লে যেটাকে বোঝায় সেটা কোনও রকমের জ্ঞান ছাড়া আর কি? তাকে ছুঁয়ে বুঝি, তাকে দেখে বুঝি, যে ভাবেই বুঝি না কেন, একটা বোঝা ছাড়া সেটা আর কি? দেখাও একটা জ্ঞান; ছোঁয়াও একটা জ্ঞান, জ্ঞান ছাড়া আর আমরা কি পাই? আমাদের কাছে আস্‌তে হলেই যখন জ্ঞান ছাড়া আর কিছু আস্‌তে পারে না, তখন জ্ঞানকেই আমরা মান্‌ব, আর কিছুই মান্‌ব না; ঘর, বাড়ী, মাঠ, বলে যা যা মনে হচ্চে সে সবই হচ্চে জ্ঞানের আকার, জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নাই, জ্ঞানের উপর ভিন্ন ভিন্ন আকার চড়িয়ে চড়িয়ে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি কর্‌চি। সে আকারগুলি কিন্তু আবার সবই মিথ্যা, কল্পিত। কারণ আকারগুলি বদ্‌লে বদ্‌লে যায়, আর যেগুলি বদ্‌লে বদ্‌লে যায় সেগুলি কথনই সত্য হইতে

পারে না কারণ সত্য যা হবে তা ত আর বদ্‌লাবে না, সত্য বরাবর একই থাকিবে, তার কিছুতেই বদল হবার যো নাই।

এই যেমন মাটি দিয়ে কলসী হয়, শরা হয়, আরও কত কত কি হয়; এই কলসী শরাগুলি হচ্চে মাটিরই ভিন্ন ভিন্ন আকার; একটা আকার বদ্‌লে আর একটা আকার করা যায়, সেটা বদলে আর একটা করা যায়, হাড়ী ভেঙ্গে কলসী, কলসী ভেঙ্গে শরা, কিন্তু এদের সকলের মধ্যেই মাটি রয়েছে। হাড়ীই কর আর কলসীই কর আর শরাই কর তাদের সকলের মধ্যে মাটি যে থাক্‌বেই থাক্‌বে; মাটি ছাড়া আর জো নেই। এই মাটিটাকেই আমরা একটা আকারে বলি হাড়ী, একটা আকারে বলি কলসী; বস্তুতঃ মাটি ছাড়া যে কলসীটা কি, তাও আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, আর মাটি হিসাবে দেখতে গেলে হাড়ী কলসী সবই এক হয়ে যায়; হাড়ী কলসী এগুলি সব মাটিরই অবস্থা। মাটিরই ভিন্ন ভিন্ন আকার, কিন্তু সেই সব আকারের মধ্যে কেবল মাটিই ঠিক হয়ে রয়েছে। তার ভিন্ন ভিন্ন আকার গুলো, যে আকার গুলোর জন্য আমরা

সেই একই মাটিকে একবার হাড়ী একবার কলসী বলি, সবই বদলে যাবে কিন্তু সব বদলের মধ্যে ঠিক্ থাক্‌বে কেবল মাটি। হাড়ী ভেঙ্গে কলসীই কর আর শরাই কর মাটি ঠিক ঠিকই থাকবে, সে বদলাবে না, তাই এদের তুলনায় মাটিই সত্য আর তার আকার গুলো সবই মিথ্যা। তেমনি জ্ঞানেরই যখন সব ভিন্ন ভিন্ন আকার ও সমস্ত আকারই যখন বদলে বদলে যায়, তখন তাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানই সত্য আর আকার গুলো যে একেবারেই মিথ্যা তা সহজেই বলা যেতে পারে। বইয়ের জ্ঞান হচ্চে; টেবিলের জ্ঞান হচ্চে, কলমের জ্ঞান হচ্চে,—সবই হচ্চে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন আকার; জ্ঞান এক একই আছে, সে জ্ঞানটার যখন একটা আকার হচ্চে, তখন তাকে বলা যায় বইয়ের জ্ঞান; আর একটা আকার হলে বলা গেল টেবিলের জ্ঞান তবেই জ্ঞান ঠিক ঠিকই থাকল, বদলে গেল তার আকারটা, একবার ছিল বইয়ের আকার একবার হোল টেবিলের আকার, তবেই আকারগুলিই কেবল বদলায় আর জ্ঞানটা বরাবর ঠিকই থাকে; কাযেই আকারগুলো সব মিথ্যা আর জ্ঞানটাই কেবল

ঠিক। তাই জড় বলে যেটা আমরা এমন সহজে অনায়াসে বিশ্বাস করে নিয়ে ছিলুম, সেটা জ্ঞানের চোখে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেল। জড় বলে কোন জিনিষই রইল না, যেটা জড় বলে মনে হচ্ছিল সেটা জড়ই নয়; কারণ জড়টা আবার কি? সেটাকে আবার কে কবে দেখেছে? যদি বল এই যে আমি দেখচি; কিন্তু ভেবে দেখ দেখি কি বলে ফেল্লে; এই কথা বলিলে যে আমি দেখেছি; যেই বলা জড় আমি দেখেছি, সেই ত জ্ঞানের মধ্যেই এলে। দেখাটা কি জ্ঞানের মধ্যে নয়; তবেই, এমনি করে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া যা যা আমরা পাব, সবই ত জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে গিয়া পড়িবে; আর ইন্দ্রিয়দের ছাড়িয়েও সেখানে আমাদের পৌছাবার কোনও উপায় নাই। যে ভাবেই কোনও তথাকথিত জড়কে আমরা পেতে চাই না কেন, তাকে পেতে হলে, জানার মধ্য দিয়েই পাওয়া যাইবে। এটা দেখিলাম, ওটা স্পর্শ করিলাম, ওটা আস্বাদ করিলাম, এইরূপ যাই করি না কেন, যে কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারাই আমরা পেতে চাই না কেন, আমরা 'জানাকে' এড়িয়ে কখনও যেতে পারব

না। তবেই 'জানার' মধ্য দিয়া ছাড়া যদি আর আমাদের পাবার উপায় নাই, আর 'জানার' মধ্যে এলেই যদি জ্ঞান হয়ে গেল তবে আর জ্ঞান ছাড়া কোন জিনিষকে ত মানা চলে না। তবেই কেবল মাত্র জ্ঞানই সত্য, আর সবই মিথ্যা, এই জ্ঞানের কোনও আকার নাই, বিশুদ্ধ। এর জ্ঞাতাও নাই, জ্ঞেয়ও নাই কারণ পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেবল মাত্র জ্ঞানই সত্য; জ্ঞাতাই বল আর জ্ঞেয়ই বল সে ত জ্ঞানেরই রূপ, তারা ত আর জ্ঞান ছাড়া নয়; তাহাদের নাম যাই হউক তাহা কাজে কাজেই জ্ঞানের আকার ছাড়া আর কিছুই নয়; তবেই এই কথাটাই সত্য হয়ে দাড়াল যে বিশুদ্ধ, বিমল ভেদশূন্য অদ্বৈত জ্ঞানই কেবল একমাত্র সত্য। সত্যই যখন মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ, তখন সত্য বলে যেটা ঠিক্ করা যাবে প্রাণপণ করে সেদিকে এগিয়ে পড়া উচিৎ; মিথ্যা গুলো ছেড়ে সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তারই দিকে ছুটে যেতে পারলেই কর্ত্তব্য সাধন করা হোল; তাই যখন অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান চরম সত্য বলে পুর্ব্ব-তনেরা বুঝলেন, তখন তাঁরা প্রাণপণ করে সেই

দিকেই এগিয়ে পড়্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগিলেন এবং সেটাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করিতে লাগিলেন; সেই সত্য, সেই সার, সেই পরম, এই যাতে বোঝা যায় সেই দিকে প্রাণপণ করিলেন। কোথায় সত্য, কোথায় জ্ঞান, বলে তাঁরা পাগল। তাদের মধ্যে যারা মনীষী তাঁরা যখন দেখলেন যে এই সংসারের সুখ ভোগ, সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ, চব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভোজন সামগ্রী, সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা, কত সরস শোভন নয়ন লোভন, আমাদের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে, এরা কেবল বিক্ষেপের সামগ্রী এরা কেহই জ্ঞান নয়, তখন তারা এদের সব ছেড়েছিলেন। তাঁরা যখন বুঝতে লাগলেন যে ইন্দ্রিয়েরা আমাদিগকে যা দেয় তার কিছুই সত্য নয়, এই যে এমন জ্যোৎস্নাহাসিনী যামিনী, এমন শ্যামলনীলাঞ্চলধারিণী ধরিত্রী, এমন জ্যোতিঃপুঞ্জখচিতবসনা অম্বর দেবতা, এমন নিবিড়নীলতমোবসনা রজনী, চৈত্রের ভ্রমর ঝঙ্কৃত মাধবানিল, গ্রীষ্মের সুভগাবগাহ নদী বিহার, উষার এমন আবেগ মধুর আরক্তিম কপোল, সন্ধ্যার সঙ্কেত ভূমিতে গোধুলির অভিসার-

লগ্নে আলো ও ছায়ার এমন বিচিত্র মিলন, আকুল আবেগে বর্ষার ছল ছল জলধারা, বিগলিত পুণ্যবসনা ফেনভূষণা জাহ্নবী যমুনা এসমস্তই মিথ্যা; মায়ের আশীর্ব্বাদ, পিতার স্নেহ, বন্ধুর সরস সম্ভাষণ, পত্নীর এমন প্রাণভরা প্রেমচুম্বন, কত আবেগ, কত উৎকণ্ঠা, লাজ, ভয়, মান, অভিমান, বিরহ মিলন, কত প্রাণভরা হাসি, আর বুক ফাটা রোদন, এ সমস্তই মিথ্যা; সত্য কেবল সেই জ্ঞান, তাই তাঁরা বল্লেন নেতি নেতি, এরা নয় এরা নয় এদের ছাড়, এদের ছাড়। তাই বলে এদের ছাড়লেন, তপোবনে গেলেন যোগাসনে বসলেন, নবদ্বার বন্ধ করলেন, নিশ্বাস রোধ করলেন যাতে বাইরের কোনও অসত্য তাঁদের স্পর্শ করতে না পারে। দেখলেন্ সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ করে, একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে, বাইরের যেগুলো "নেতি নেতি" সেগুলোকে একেবারে তাড়িয়ে দিয়ে, মনটাকে একটা কোনও জায়গায় আবদ্ধ করতে পারেন কিনা। এমনি করে তারা সত্যকে যেভাবে বুঝেছিলেন সেই ভাবেই তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। যাতে বিক্ষেপ আনে, যাতে কর্ম্ম-শৃঙ্খলার মধ্যে পড়তে হয়, তা থেকে তাঁরা ক্রমশঃ

ক্রমশঃ সরে সরে যেতে লাগ্‌লেন, তাদের নিজেদের মনের মধ্যে যে চিন্তাগুলি আস্‌তে লাগল তা'ও তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে দূর করিতে লাগিলেন। কেবল দেখতে লাগ্‌লেন মনটা যাতে এক জায়গায় স্থির হয়, যাতে কোনও চিন্তা না আসে। এমনি করে তাঁরা শরীর পাত করতে লাগলেন যাতে তাঁরা সত্যকে যেভাবে মনে করে নিয়েছিলেন সেই ভাবেই তাকে পেতে পারেন। তাঁরা যে বীর্য্যবান্, মহান্, তাঁদের কে রোধ করে! যা ভাল বুঝেছিলেন তাই করবেন, এক চুল'ও এদিক্ ওদিক্ নড়বেন না, একেবারে স্থির; সুখভোগ, আসক্তি, ইন্দ্রিয় লালসা, যার জন্য আমরা ঘুরে ঘুরে পাগল, এসব তাঁরা ছেড়ে দিতে লাগলেন, সব ত্যাগ করতে লাগলেন কেন না এইসব ক্ষুদ্র জিনিষ ত্যাগ করে তাঁরা মনে করলেন যে তাঁরা আরও একটা খুব বড় জিনিষ পাবেন সেটা হচ্চে "সত্য"। জ্ঞানকেই তাঁরা সত্য বলে বুঝেছিলেন তাই সত্যের আকর্ষণে সত্যের জন্য তারা সব ছেড়ে দিতে লাগলেন। একদিন সত্যের জন্য সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে তাঁরা চিরকালের জন্য ধন্য ধন্য হয়ে

গেছেন। তাঁরা বীর ছিলেন; অস্থি মাংস মজ্জা শুকিয়ে লয় পেয়ে যাক্, শরীর জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালাবশেষ হয়ে যাক, তবু সত্যকে ছাড়া হবে না। সত্যকে যেমন করে হোক্ পেতেই হবে; সত্যের জন্য যে, মানুষ এত ত্যাগ কর্‌তে পারে তা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কেউ কখন দেখেছিল কিনা সন্দেহ। একি সহজ কথা! সব ছেড়ে দিয়ে শুধু সত্যকে সাম্‌নে রেখে চিরকাল দৌড়ব। এ বীরত্বের মহত্ব কে ব্যাখ্যা করতে পারবে? মানুষ যতদিন সত্যকে আদর করতে জানবে, যতদিন তাদের কণ্ঠ থাকবে ততদিন তারা তাঁদের জয় গান সমস্ত পৃথিবীতে উচ্চকণ্ঠে গাইবেই গাইবে। তাঁদের ত্যাগধর্ম্ম চির-কালের জন্য তাঁদের অমর করে রেখেছে, আমরা বলে বলে কেবল তার পুনরুক্তি করছি মাত্র।

সত্য জিনিষটার সীমানা থেকেও নাই; এমন একটা জায়গা নাই যেখানে এসে কেউ বল্‌তে পারে যে আমি এখন সত্যকে বুঝে শেষ করে ফেলেছি। সত্যকে যতটা বুঝবে ততই দেখবে যে বুঝতে পার নাই। যত সত্যকে পাবে তত সে আরও দূরে যাবে এবং যতই তুমি ছুটে যাবে, ততই সে

আরও সরে যাবে, আর তুমি আরও তাকে পেতে চাবে, এমনি করে সে ক্রমশঃই তোমাকে তার আপন গভীরতার মধ্যে টেনে টেনে নিয়ে যাবে। তুমি যতই যাবে ততই দেখবে যে পথের আর শেষ নাই, বরাবর পথ চলে গেছে; কোথায় যে গেছে তা সে পথই জানে আর বলে দিতে পারে। কোনও একটা কিছু দিয়ে যদি সেটাকে গণ্ডী দিয়ে দিতে পারি যে এর ওপারে আর নাই, তবে সেটা সত্যই নয় বরং তার বিপরীতটা। যদি কোনও একটা বাঁধন দিয়ে দেখিয়ে দিতে পার্‌তুম্‌ যে এই পর্যান্তই সত্য তবে নিশ্চয়ই আমার একথা বলা হোত যে বাঁধনের ওপারে আর সত্য নেই, তাহলে আর সেটা সত্যই বা হোত কেমন করে। সত্য যে, তাকে ত কেউ রুখে রাখতে পারবে না, যে পড়ে থাকল যার সম্বন্ধে বলতে পারলাম যে সে এই পর্য্যন্ত এর ওপারে আর নেই সে সত্য হবে কেমন করে। সেত সকল জায়গায় নেই, যে সকল জায়গায় নেই সেত বাধা হোল, সত্য ত তাকে উল্লঙ্ঘন করে যাবে, বাধা যে সেই কেবল বাঁধা হয়ে থাকে ছোট হয়ে থাকে যাতে সত্য তাকে

উল্লঙ্ঘন করে যেতে পারে ; সত্য যে, তার অনিরুদ্ধ প্রসার। তাই বল্‌ছিলাম যেএমন কেউ নেই যে বল্‌তে পারে আমি সত্য দেখেছি, সত্য এতটুকু। যেই বলেছে যে সত্য এতটুকু সেই বুঝিলাম যে সে সত্যকে বাধার মধ্য দিয়ে দেখেছে সমস্তটা দেখে নাই! সত্য তার কাছে সমস্ত অঙ্গের আবরণ খুলে দেয় নাই। যতটুকু দেখেছে তাই নিয়েই সে বল্‌ছে যে আমি সত্যকে জানি সেটা অমুকটা, তার প্রসর এতটা। যা যেখানে আছে সবই সত্য। সত্যকে বাদ দিয়ে কিছুরই হবার যো নাই। এমন যে বাধা, যাকে না কি আমরা বলি যে সে খাট, সে সত্যকে রুখে রাখে, সেও সত্য। সত্য যদি বাধাই না হতেন তবে বাধাটাই বা আসে কোথা থেকে? বাধার বাইরেই সত্য একথা যদি বল্‌তে যেতুম তবে সেইখানেই আমার সত্যকে ঠেকিয়ে রাখা হোত, সত্যের স্বভাবটা আমাদের বোঝবার গণ্ডীর ভিতর থেকে অনেক বাইরে গিয়ে পড়ত। বাধা যে সেও সত্যেরই বাধা, সে সত্যেরই আবরণ। সত্য নিজেকে ফোটাবার জন্য বাধাকে নিজের গায়ের ভিতর থেকে বের করে দিয়েছে, তাই

বাধা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেই সেখানে সত্যের প্রকাশ হয়। বাধার সাম্‌নেই সত্য নিজকে একটু একটু করে নিরাবরণ নিরাভরণ করে, তাই সত্যকে খুলতে গেলেই বাধা চাই। তোমার শক্তি অল্প তুমি খুব বড়াই করচ, লোকে জানতে পার্‌চে না তোমার সামর্থ্য কতটুকু, যেই বাধা এল তোমার জারি জুরি ফাক হয়ে গেল। তোমার যতটুকু সামর্থ্য সত্য ছিল তাই প্রকাশ হয়ে পড়ল। তোমার গায়ে কতটা জোর আছে ঠিক পাচ্ছ না, একটা ওজন তুলতে গেলে, ওজনটাও মাটি হতে উঠতে চায় না, তুমিও চাও তাকে মাটি থেকে তুলতে; তাতেই ওজনটা তোমাকে বাধা দিতে লাগল; তোমার যতটুকু জোর তাও প্রকাশ হয়ে পড়ল। এ যেমন ছোট ছোট বিষয় নিয়ে একটা বুঝাতে চেষ্টা করলুম তেম্‌নি সকল বিষয়েই কথাটা খাটবে। এম্‌নি যে বাধা সে বাস্তবিকই সকল সময়ে সত্যকেই ফুটিয়ে দেয়, তাই তার কাজ, তাই সেও সত্যের অবয়ব।

তাই আমাদের পূর্ব্বতনেরা যখন ভাবলেন যে জ্ঞানই সত্য আর তার আকারগুলো সবই মিথ্যা একেবারে সত্যের বাইরে, তখন তাঁদের একটা

মস্ত ভুল হোল; তাঁরা দেখতে পেলেন না যে আকার গুলোর মধ্য দিয়াই জ্ঞান ফুটে উঠছে, আকারগুলো বাদ দিয়া শুধু জ্ঞানকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; অবশ্য একথাটা তাঁরা খুব ঠিকই বলেছিলেন যে একটা আকার বদলে আর একটা আকার হয়, কিন্তু তাই বলে তাদের মিথ্যা বলা চলে না। জ্ঞানের একটা আকার বাদ দিলে আর একটা আকার হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানকে কি কখনও আমরা আকার ছাড়াতে দেখেছি? স্বীকার করলুম মাটির, কলসীর আকারটি গিয়ে হাড়ীর আকার হয়েছে, আবার সেটা গিয়ে হয় ত সরার আকার হবে, কিন্তু তাই বলে কি আমি একথা বলতে পারি যে মাটিকে কখনও আমরা এমন অবস্থায় দেখিছি যখন তার কোনও আকারই ছিল না। যখনই মাটি ছিল তখনই তার কোনও না কোনও একটা আকার ছিল, একেবারে কোনও আকারই নাই এমন অবস্থায় আমরা কখনই মাটিকে দেখি নাই। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি, একটি জ্ঞেয় গিয়ে আর একটি জ্ঞেয় আসে, একটা জ্ঞাতা গিয়ে আর একটা জ্ঞাতা আসে বটে, কিন্তু জ্ঞাতা জ্ঞেয় ছাড়া ত

কখনও জ্ঞানকে দেখি নাই। আমি দেখেছি বটে যে আমার বইয়ের জ্ঞানটা বদ্‌লে টেবিলের জ্ঞান হয়, কলমের জ্ঞান হয়, দোয়াতের জ্ঞান হয়, কিন্তু কিছুরই জ্ঞান হয় না এমন কি জ্ঞানের কোনও অবস্থা দেখেছি। একটা না একটার জ্ঞান হয়ই হয়। এমন কখনই দেখা যায় না যে জ্ঞান রয়েছে অথচ তার কোনও একটা বিষয় নাই। সেই বিষয়গুলিই হল জ্ঞানের আকার। তবেই একটা আকার বদ্‌লে আর একটা আকার হয় বটে কিন্তু আকার ছাড়া ত কখনও জ্ঞানকে দেখি নাই; আমরা কল্পনাই করতে পারি না যে জ্ঞান আছে অথচ তার কোনও জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় নাই; যেখানেই জ্ঞান দেখা গিয়াছে সেইখানেই তাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সহিত জড়িত হয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে, তাদের ছাড়িয়ে কখনও জ্ঞানকে দেখা যায় নাই। কাজেই যদিও কোনও রকমে জোর করে কল্পনাও কর্‌তে যাই যে এমন একটা অবস্থা হতে পারে যখন শুদ্ধ জ্ঞানই থাক্‌বে আর কোনও জ্ঞাতাও থাক্‌বেনা কিম্বা জ্ঞেয়ও থাক্‌বেনা তা হলেও আমরা কখনই স্বীকার করতে পারব না যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় গেলে বাকী যদি কিছু

পড়িয়া থাকে তবে সেটাকে কোনও রকমে জ্ঞান বলা যাইতে পারে। সেটাকে কি নাম দিবে তা জানিনা, কিন্তু তাকে জ্ঞান বলতে যা বুঝি তা বলতে পারব না। আর যদি বাস্তবিক আকারটা জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্নই হোল তবে জ্ঞানের সঙ্গে তার সঙ্গে একটা সম্পর্কই বা হোল কি করে, কে তাদের সম্পর্ক ঘটিয়ে তুল্লে। প্রাচীন-দের মনেও যে একথাটা একেবারে না উঠেছিল তা নয়; খুবই উঠেছিল এবং তাঁরা জ্ঞানের আকার জিনিষটা যে কি তাই নিয়ে একটু ব্যতি-ব্যস্তও হয়ে পড়েছিলেন। শেষটা যখন আর কূল কিনারা পেলেন না তখন বল্লেন, বিশুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞানই সত্য, তাই মাত্র আমরা জানি, তার আকারটা যে কি তা আমরা জানিনা তাই তারা আকার-টার নাম দিলেন **জানিনা বা অবিদ্যা।** যখন আকারটা কি তা তাঁরা জানি না বল্লেন তখন সেই দিক্ দিয়ে অনেকটা লেঠা তাঁরা চুকিয়ে দিবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আকারের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ কি জিজ্ঞাসা করলে স্পষ্ট উত্তর দিতে লাগি-লেন, যে, যখন আকারটাকেই আমরা জানি না

বলেছি, তখন সেই "জানিনা" টার সম্বন্ধ যত কথাই তুমি জিজ্ঞাসা করবে তা আমি বলতে পারব না।

জানিনা সম্বন্ধে সকল কথাই অনির্বাচ্য, কাজেই "জানিনা" বা অবিদ্যার সঙ্গে জ্ঞানের যে সম্বন্ধ তাও অনির্বাচ্য। সম্বন্ধ আছে কিনা তাও বলিতে পারেন না। তাই বলিতে লাগিলেন হাঁ সম্বন্ধ আছে বটে, নাইও বটে। সম্বন্ধটা যখন জানিনা তখন সম্বন্ধটা ঠিক কি ভুল তাও বল্‌তে পারি না। "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং অনির্ব্বচনীয়ম্"। এই "জানিনা" বা অবিদ্যাকে তাঁরা গিলিয়া ফেলিবেন না উদ্গীরণ করিবেন তার কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। অবিদ্যা-টাকে মিথ্যা বল্‌তে লাগিলেন অথচ সেটা ছাড়া এই সমস্ত জাগতিক ভেদের উপপত্তিও করে উঠ্‌বার কোনও বন্দোবস্ত করে উঠতে পারলেন না। কাজেই জাগতিক সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সেই অবিদ্যাটাকে টেনে টেনে আনতে লাগ্‌লেন এবং সেই অবিদ্যা এবং জ্ঞান এই দুটার সহ-যোগেই এইসমস্ত জাগতিক ভেদ ঘটে উঠছে এটা বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। জগৎকে

মিথ্যাই বলুন আর যাই বলুন এটাতো মানতেই হোল যে এর মধ্যে একটা কার্য্য কারণের শৃঙ্খলা আছে একটা নিয়ম আছে, অথচ সে নিয়মটা, তাঁরা যেটাকে সত্য বলেছেন সেটা দ্বারা ঘটিয়ে উঠাতে পারলেন না, কাজেই সেই নিয়মটাকে ঘটিয়ে তোলার জন্য যে শক্তিটা দরকার সে শক্তিটাকেও তাঁদের মানতে হোল এবং সে শক্তিটাকে ঐ "জানিনা" বা অবিদ্যাটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বল্লেন ওটার নাম মায়াশক্তি। এবং এই সঙ্গে সঙ্গেই যে অবিদ্যাটা পূর্ব্বে একটু অভাবাত্মক বা negative গোছের ছিল সেটাও যেন ক্রমশঃ positive বা ভাবাত্মক হয়ে উঠল। আগে যেন অবিদ্যাটাকে কতকটা এই ভাবে বলা হোত যে সে যেন "জানার" বাইরের একটা কিছু। জ্ঞান যেটা, সত্য যেটা, সেটা নয়; আর একটা কিছু, কি তা জানা নাই কাজেই এরকম ভাবের বোঝাটা যেন কতকটা negative রকমের ছিল। ক্রমশঃ সেই অবিদ্যাটা একটা ভাবাত্মক positive শক্তি হয়ে দাড়াল। আর সেই শক্তিটার সহিত জ্ঞানের সহযোগে, জ্ঞানের সঙ্গে তার সংক্রমণে

যেন এই বহুধা বিচিত্র জগৎ ফুটে উঠ্‌ল। সত্যকে তাঁরা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু সত্য এক রকম করে তাকে স্বীকার করিয়ে নিয়েছে সে ছাড়ে নাই ; না মান্‌তে গিয়েও তাকে ব্রহ্মের বা সত্যের সমানই একটা সত্তা দিতে হয়েছে। এমন কি শেষে এ পর্য্যন্তও বলেছেন যে মায়াটা ব্রহ্মের বা জ্ঞানেরই শক্তি। এই যে ব্রহ্ম বা জ্ঞান, তিনি মায়া ছাড়িয়ে থাকলেও মায়াকে ছাড়া ফুটতে পারেন নাই। মায়ার মধ্য দিয়েই তাঁকে যেতে হয়েছে এবং এই মায়ার মধ্য দিয়াই বহুধা বিচিত্র জগৎ ফুটে উঠেছে। তিনি যে আমার কাছে প্রকাশ হবেন তাও এই মায়ার মধ্য দিয়াই। আর এই মায়াটাও যখন তাঁরই শক্তি, তখন তাঁর থেকে যে এটা একেবারে ভিন্ন তাও যেন বলা যায় না, আর একেবারে ভিন্ন হলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কেই বা আসে কি করে তাকে বাধাই বা দেয় কি করে। ব্রহ্ম বা সত্যকে একেবারে পরিনিষ্পন্ন, নিষ্ক্রিয়, তটস্থ ও নিশ্চল বলতে গিয়েই এত গোল বেধে গেল। সত্য যে ক্রিয়াস্বরূপ তিনি যে নিজেকে ফোটাতে ফোটাতেই যাচ্ছেন একথাটা

না বুঝে তাঁকে একেবারে নিশ্চল বলে যেই একে-বারে স্থির করে ধরা গেল, তখনই তার যে বাস্তবিক স্বরূপ, তার যে সেই চল স্বভাব সেটা রুখে দাঁড়াল। রুখে দাঁড়িয়ে, কোনও রকম না কোনও রকম করে তাঁদের মুখ দিয়েই সে তাকে মানিয়ে নিলে। স্পষ্টতঃ তাকে দেখতে পেলে, স্পষ্টতঃ তাকে মানলে অনেক গোলমালের হাত থেকে বাচা যেত, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে তাঁকে স্পষ্টতঃ মানা হোল না, তখন তিনি ভাবলেন যে স্পষ্টতঃ না মানলেও তোমাকে দিয়ে আমি মানিয়ে নেবই নেব, ছাড়ব না এবং এক ভাবে না এক ভাবে সেই তাকে মানতেই হোল। কিন্তু এতেও তিনি ছাড়লেন না যতদিন স্পষ্ট করে তিনি না মানিয়ে নিতে পারবেন ততদিন তিনি ছাড়বেনও না। তাই.তিনি এর পরেই রামানুজের ভিতর দিয়ে বলালেন যে, মায়াটা মিথ্যা নয়, তাঁরই শক্তি। জীব, জড়জগৎ এবং ঈশ্বর এ সমস্তই সেই ঈশ্বর, জীব ও জড়জগৎ ঈশ্বরেরই অবয়ব বা দেহ। জীব ও সত্য, জড়ও সত্য, ঈশ্বরও সত্য। সত্যব্রহ্ম বলতে কোনটাই বাদ দেওয়া চলবে না। যেমন বেল বলতে

তার খোসা তার বীচি সবগুলো জড়িয়েই বলা যায়, কোনটাকে বাদ দেওয়া যায় না, তেমনি সত্য বলতে কোনটাকে বাদ দেওয়া চলবে না। জীব, জড়, ঈশ্বর এসমস্ত নিয়েই তিনি। কিন্তু এর মধ্যে একটা দোষ রয়ে গেল এই, যে, এখানেও সত্যকে বাস্তবিক ক্রিয়া স্বরূপের মধ্যে দেখা হোল না। ঈশ্বর যেন একটা সিদ্ধ পরিনিস্পন্ন নিশ্চল বস্তুর মতনই রয়ে গেল, এবং তার অবয়ব গুলোও যেন কাটা কাটা রকমে যে যার জায়গায় নিশ্চল হয়ে রয়ে গেল, তিনিই যে ফুটে এইসব হয়েছেন, এবং আপনার চেষ্টায় ফুটতে ফুটতেই চলেছেন, কাজেই তিনি যে গুণের মধ্য দিয়ে ফুটে সগুণ হলেও নির্গুণ রামানুজ যেন তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। সত্যকে যা তিনি দেখেছেন তাঁর মধ্যেই এনে আটক করে ফেল্‌লেন। তিনি তাঁর দেবতাকে সগুণ বলেই বুঝালেন, এবং তার গুণগুলি আমরা গুণে উঠতে পারি না 'অসংখ্যেয় কল্যাণ গুণগণ' এই বলে তাঁর মহত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা কর্‌লেন; কিন্তু অনন্তকে আমার গুণতে পারা না পারা দিয়ে তার অনন্তত্বের নির্ণয় করব এটা যে

একটা নিতান্ত হাত গড়া উপায়। আমি যে কত ক্ষুদ্র! আমি একটা জায়গায় দাড়িয়ে তাঁর একটা ইয়ত্তা বা কল্পনা করে উঠতে পারব না সেটা আর একটা বেশী কথা কি? আমি একটা জিনিষ গুণে উঠতে পারব না বলেই কি সেটার অনন্তত্ব প্রমাণ হয়ে গেল। তাঁর স্বভাবের থেকে যদি তাঁর অনন্তত্ব না বের করা যায়, যদি এটা না বোঝান যায়, যে তাঁর যা যথার্থ স্বরূপ তা কল্পনা করিতে গেলেই তাঁকে কোনও জায়গায় বেঁধে রাখা চলে না তা না হলে ত তাঁর অনন্তত্ব কিছুই বোঝান গেল না। আমি বুঝতে পারি না সেই টুকুই যে অনন্তের পরিমাণ, সে অনন্ত ত আমার দুর্ব্বলতার ভারেই নিপীড়িত হয়ে রয়েছে। যার স্বাভাবিক সবলতা নাই, যে আমারই তুলনায় সবল, সেত প্রায় আমারই মতন দুর্ব্বল, কাজেই এখানে দেখা যাইতেছে যে সত্যকে বড় করতে গিয়েও বড় করা যায় নাই সে সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে। যেসমস্ত খণ্ডের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে ফুটিয়েছে সে যেন তাদেরই ভারে খাট হয়েছে। সত্যের বাস্তবিক স্বরূপ না বুঝতে পেরে তাকে কেবল মাত্র সগুণ

বলে ধরা গেছে বলেই এত মুস্কিল। সত্যকে যেন পঙ্গু করে রাখা হয়েছে কাজেই তাকে যেখানে রাখা গিয়াছে সেখান থেকে তাকে না সরালে তার আর উঠে হেটে বেড়াবার যো থাকবে না। রামানুজ তাকে এই সমস্ত ভেদের মধ্যে, সগুণের মধ্যে, রাখলেন আর সেও সেইখানেই রয়ে গেল।

সে যে সগুণত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবে তা সে পারলনা তার মধ্যেই রয়ে গেল। কাজেই বাস্তবিক সত্যের সন্ধান হোল না। রামানুজ এটা ঠিক ধরে ছিলেন যে যা কিছু দেখছি তা সমস্তই সত্যের অবয়ব তা সমস্তই সত্য। তারা মিথ্যা নয়। কিন্তু এটা তিনি বুঝে উঠতে পারলেননা যে কেমন করে তারা সত্য হোল। বাস্তবিক তত্ত্বের দিকে তিনি যে অনেকটা এগিয়েছিলেন সে কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যেতে পারেনা; অচিৎ, চিৎ এবং ঈশ্বর তিনটিই তাঁর বিভাগ, এতে যেন মনে হয় এরা সব তাঁর অবয়ব হলেও তাঁর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। আর সত্য যে সেই এ তিনটি নিয়েই; যেন একটা আদি একটা মধ্য আর একটা অন্ত। কিন্তু এই ভাবের কল্পনায় একটা এই দোষ

রয়ে গেল যে অন্ত বলে যেটাকে কল্পনা করা গেল, সেটা সেই খানেই রয়ে গেল, তার আর তাকে ছাড়িয়ে যাবার উপায় থাকল না। কাজেই সে যেন সেখানে এমন একটা বাধার মধ্যে এসে পড়ল যার থেকে সে সহজে উঠতে পারবে না। সেই খানেই তার একটু গোল বেধে গেল। সে যে সকল গুলির মধ্যে এমন করে আনা গোনা করবে যাতে তার কোনও জায়গাকেই আদি কি মধ্য বলার যো থাক্‌বেনা, সেটি আর ঘটে উঠতে পারলনা। কাজেই তার স্বাভাবিক অনন্তত্বটুকু আর থাকলনা, তাঁর অনন্তত্ব যেন ধার করা অনন্তত্ব হয়ে পড়ল, আমারই কল্পনার চক্ষে অনন্ত হোল। কাজেই সে আমারই গণ্ডীর মধ্যে পড়ে থেকে আমারই মতন ছোট হয়ে পড়ল, তাই রামানুজের মধ্য দিয়ে তিনি তাকে ঠিক ফোটাতে না পেরে শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রাদায়ের মধ্য দিয়া ও পরিশেষে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মধ্য দিয়ে আপনাকে ফোটাতে চেষ্টা কর্‌লেন। তাঁর অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে, তিনি সত্যকে দ্বৈত কি অদ্বৈত, এর একটার মধ্যেও নির্ব্বাচন করা যায়না এই

পরম সার কথাটী জগৎকে শুনিয়ে দিলেন। তিনি বুঝ্‌লেন না যে সত্য দ্বৈতও বটে, এবং অদ্বৈতও বটে; কোনও একটার মধ্যে সত্যকে রুখে রাখা যায়না। দ্বৈতের মধ্যে রুখতে গেলে সে অদ্বৈতের মধ্যে গিয়ে পড়ে আর অদ্বৈতের মধ্যে রুখতে গেলে সে দ্বৈতের মধ্যে এসে পড়ে। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মধ্যেও এই অসীম ও সসীমেরই মিলনের কথাটি নানা রসে রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে। একই অদ্বয় থেকে রাধাকৃষ্ণ বেরিয়ে এসেছেন, এবং তাঁদেরই রাসযাত্রায় ব্রজকুঞ্জ ভরপুর। ব্যক্ত অব্যক্তের কি অদ্ভুত মিলন! "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে," রাধিকা কৃষ্ণেরই অপেক্ষা করেন; কৃষ্ণও কুঞ্জে কুঞ্জে রাধিকারই প্রেম ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। কুঞ্জে কুঞ্জে তিনি বাঁশী বাজান, আর ঘরে ঘরে গোপিকারা সমস্ত গৃহকার্যের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যেই তাঁর বাঁশী বাজে, অমনি তারা "চমকিত মন চকিত শ্রবণ" হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের মন কোথায় উধাও হয়ে যায়, কলের মতন কায করিতে যায়, পদে পদে ভুল হইতে থাকে। স্তনকুঙ্কুম দিয়া কাজল পরিতে যায়, আর কাজলের কালি স্তনে মাখাইয়া ফেলে।

তারপর মঞ্জুল বঞ্জুল বনপথে কৃষ্ণসলিলা যমুনায় জলবিহার। গোপিকারা তাকে প্রাণ ভরে ভাল বাসে, কিন্তু তখনও যেন নিরলঙ্কার নিরাভরণ হইতে প্রস্তুত নয়, তাই তিনি তাঁদের বস্ত্র কাড়িয়া লইলেন, সব লজ্জাভয় কেড়ে নিয়ে যেন তাদের অন্তরঙ্গ করে নিলেন; তার পর আর কত বলিব! প্রতি নিশায় রাস আর ঝুলন—যত বলিব আর ফুরাইবেনা। ইহার তত্ত্ব ভাল করিয়া বলিতে গেলে পৃথক প্রয়াসের প্রয়োজন, তাই এখানে কেবল কথাটার নির্দ্দেশ মাত্রই করিয়া গেলাম। তাই বলিতেছিলাম যে সত্যকে না মানিলেও সে কোনও রকমে না কোনও রকমে মানাইয়া লইবে, লাভের মধ্যে কেবল সাজা পাইতে হইবে। তাই যখন সত্যকে আমরা দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে স্বীকার করি নাই, তখন সে আমাদের দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যেই নানারূপ বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে আপনাকে মানিয়ে নিতে লাগ্‌ল এবং তারই ফলে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকবাদও দাঁড়াতে লাগল।

দার্শনিক হিসাবে সত্যের ধারণা অনুসারেই তাঁহাদের বাহিরের ব্যবহারিক জীবন তাঁরা চালিয়ে-

ছিলেন। কাযেই এটা যদি স্বীকার করা যায় যে দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে ঠিক সত্যকে কল্পনা করা হয় নাই এবং তার যথার্থ স্বভাবের দিকে দৃষ্টি না রাখাতে তাকে অবজ্ঞাই করা হয়েছে তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে সেই দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে বাহিরে যে ভাবে জীবন কাটান গিয়েছে তাতেও সত্যকে অবহেলা করা হয়েছে, অপলাপ করা হয়েছে। দার্শনিক মতের মধ্যে অস্বীকার করাতে দার্শনিক মতের মধ্যেই বিপ্লব ঘটে উঠেছিল আর প্রকৃতির সহিত বাস্তবিক ব্যবহারের সময় তাকে স্বীকার না করাতে বাহিরের বিপ্লব ঘটে উঠল। তাঁরা জড়কে না মেনে বনে গেলেন, সেখানে নিরিবিলির মধ্যে যোগাসনে বসে নবদ্বার রুদ্ধ করে খালি জ্ঞানকেই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতে লাগলেন; জড়ের মধ্য দিয়েও যে সত্যই ফুটে উঠ্‌ছে; জড়ও যে সত্যেরই অবয়ব তা তাঁরা স্বীকার করলেন না। কাযেই দেশে জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চাও বন্ধ হয়ে গেল, ইতিহাস ভূগোল, গণিত, যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্তই তিরস্কৃত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কখন কেউ কেউ তাদের চর্চ্চা করত মাত্র। কাযেই দেশে তাদের সঞ্চার

ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, এবং বিদেশীয়েরা যখন সেই সব জড় বিজ্ঞানের বলে এসে আমাদিগকে আক্রমণ করতে লাগল তখন আর আমরা পথ খুঁজে পেতে লাগলুম না। যে বিদেশীয় এসেছে সেই ভারত-বর্ষকে হটিয়েছে। কেন হটিয়েছে? কারণ বিদেশীয়েরা জড়কে সত্য বলে মনে করতেন, এবং জড় শক্তির দিকে লক্ষ্য রাখতেন; আমাদের দেশের তাঁরা জড়ের মধ্যে তাকে মানতেন না, তাই জড় শক্তির দিকে দৃষ্টিও তাদের ছিলনা। সত্যের একটা দিক্‌ তাঁরা দেখেন নাই, একটা দিক্‌কে তাঁরা অস্বীকার করে ছিলেন, তাঁরা জ্ঞানের মধ্যেই সত্যকে মেনে ছিলেন, জড়ের মধ্যে সত্যকে দেখতে পারেন নাই; কিন্তু সত্য তা শুনবে কেন, তাকে যেদিক্‌ দিয়ে মানা হয় নাই সে সেই দিক্‌ দিয়েই আক্রমণ আরম্ভ করল। যে বিদেশীয় আসিতে লাগিল, সেই আসিয়া ভারত্‌ জয় করিতে লাগিল। আমরা তাহাদের অধীন হইয়া পড়াতে আমাদের শরীর ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া পড়িতে লাগিল, শরীরের দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ মনের উপর সংক্রমিত হইতে লাগিল। কারণ সত্য হচ্চে জ্ঞান এবং জড় এই দুইকে নিয়ে; তা তুমি একটাকে বাদ

দিয়ে একটাকে নিয়ে যতই বাড়াতে চাও পারবে না। তোমার শরীরটাকে একেবারে অবহেলা করে কেবল যদি মনটাকেই বাড়াতে চাও, তবে ফল হবে এই যে কিছুকাল বাড়িয়ে আর শেষে পারবেনা, মনও জীর্ণ হয়ে আস্‌বে, কারণ শরীর ও মন একত্র গ্রথিত। তাই তুমি একদিকে মনকে বাড়াতে চেষ্টা করলেও আর এক দিয়ে হু হু শব্দে ক্রমে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করতে আরম্ভ করবে, কাযেই মনও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌বে। অনেকের হয়ত ছান্দোগ্য উপনিষদের গল্পটা মনে আছে যে, পনর দিন না খাওয়ার পর শ্বেতকেতুকে যখন তাঁর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বেতকেতু একটা কথাও বলিতে পারিলেন না; অথচ তাঁর সমস্ত বেদ ইতিপূর্ব্বে কণ্ঠস্থ ছিল। তার দেহের দুর্ব্বলতা এসে তার মনকে আঁকড়ে ধরে ছিল তাই তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না। এখানেও ঠিক সেই রকম হয়ে পড়ল। জড়ের দিকে আক্রমণের ফলে যেই শরীর জীর্ণ হয়ে পড়্‌তে লাগল, অমনি তাদের এত যে জ্ঞান তৃষ্ণা তাও যেন কোথা থেকে লোপ পেয়ে যেতে লাগ্‌ল। আর আক্রমণের উপর আক্রমণ, আমাদিগের সামনে সকল সময়েই

এই কথাটা জানিয়ে দিতে লাগ্‌ল যে আমরা ভুল করেছি, জড়ও সত্য; তাকে অবহেলা করা যায় না, এবং করাও উচিত না। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা এটা বুঝিতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত ধাক্কার উপর ধাক্কা আমাদের উপর আসতেই থাক্‌বে। নিপীড়নে নিপীড়নে জড় আমাদিগকে বুঝিয়ে দেবেন যে তিনি আছেন, তাকে হেলা করে ঠেলে ফেল্লে তিনি যাবার জিনিষ নয়; তাকে অস্বীকার করতে গেলেও তাঁকে স্বীকার করতে হবে। তাই আজ বিদেশীয়দিগের অতুল জড়বিজ্ঞান আমাদিগকে উপহাস করে বলছে, 'কি হে আমাকে তোমরা অস্বীকার করেছিলে, কিন্তু তাই বলে কি আমি অস্বীকৃত হয়ে থাকব। যারা আমাদের কোলে তুলে নিলে আমরা তাদের কাছে গেছি, আর তোমরা আমাদের স্বীকার কর নাই বলিয়া তোমাদের আজ এই দুর্গতি। সত্য বাস্তবিক এমনি করে বাধার মধ্য দিয়েই নিজকে প্রকাশ করে; একেবারে নিরাবরণ হয়ে কোথাও দেখা দেয় না। একটা বাধার মধ্য দিয়া নিজকে সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করে আবার সেই বাধাটিকে পার

হয়ে গিয়ে নিজকে আর একটু প্রশস্ত ভাবে প্রকাশ করে। এমনি করেই চলতে থাকে। বাধার পর বাধা এবং প্রতি বাধায়ই একটু একটু করিয়া নিজকে প্রকাশ; কোন বাধাই তাকে বেঁধে রাখতে পারে না, সকল বাধাই সে অতিক্রম করে এবং প্রতি অতিক্রমণেই সে দেখিয়ে দেয় যে সে সত্য, তাকে কেউ ঠেকিয়ে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। সকল বাধাই সে অতিক্রম করে এবং প্রতি অতিক্রমণেই সে দেখিয়ে দেয় যে সে সত্য, তাকে কেউ ঠেকিয়ে, বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। সত্য এবং বাধা এ তুটা জিনিষ যে একেবারেই ভিন্ন, তা নয়। বাধা যে, সেও একরূপ সত্যেরই স্বরূপ। সত্যকে তুমি যেখান থেকেই দেখ না কেন, তুমি দেখতে পাবে যে বাধা তার শরীরের সঙ্গে লুকিয়ে রয়েছে। সত্যের যেখানে যতটা প্রকাশ, তার মধ্যের বাধাও ঠিক ততটুকু। কারণ যতটা তার প্রকাশ ততটার মধ্যেই সে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, বাঁধা পড়ে গিয়েছে। একদিক্ দিয়ে দেখলে যাকে সত্য বলে দেখব আর এক দিয়ে দেখতে গেলে তাকেই বাধা বলে দেখব।

তাই প্রকাশের দিক্ দিয়ে এবং বাধার দিক্ দিয়ে এই দুইদিক্ দিয়ে না দেখলে সত্যকে ঠিক বুঝে উঠা যায় না। একটা জিনিষ বুঝতে হলেই, সেটা কি, তাও যেমন বুঝতে হয়, তেম্‌নি সেটা যে কি নয় তাও বুঝতে হয়। তবে গিয়ে জিনিষটা বোঝা যায়। দুদিক দিয়ে না বুঝলে জিনিষটাই বোঝা হয় না। তাই ইংরাজীতে বলে differentiation না হলে, knowledgeই হয় না। সত্যকে তুমি যেখানেই ধর না কেন দেখবে যে সে তার বাধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। সত্যের স্বভাবই এই যে সে আপনাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ফোটাতে ফোটাতে যাবে; আর এই জগৎ যা দেখ্‌চি সমস্তই হচ্চে সত্যের স্বরূপ। তাই জগতের যে স্তরে, যে জায়গায়, যতই আমরা হাত দিই না কেন, আমরা দেখতে পাব যে তার সঙ্গে বাধা জড়িয়ে রয়েছে; কারণ সকল জায়গাতেই আমরা সত্যের প্রকাশ দেখতে পাই। চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমরা একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। সেই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে এত ভেদ এবং বৈচিত্র্য রয়েছে, তাহাতেই আমাদের কাছে সত্যের প্রকাশের একটা

পরিমাণ বুঝিয়ে দিচ্ছে, এবং সেই জন্যই আমরা সেগুলিকে সত্যের বাধা বলি। সত্য সকল সময়েই এগুলি ছাড়িয়ে উঠ্‌তে চায়, কারণ সত্যকে সকল সময়েই চলতে হবে, কোনও জায়গাতে এসে থেমে গেলেই তার হার হোল, সে সত্য হোতে পারল না; তাই সত্য তার শরীরের সঙ্গে এমনি করেই বাধাকে জড়িয়ে নিয়েছে, যে সে তার নিজের অমরত্বের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাধাকেও অমর করে রেখেছে। সেই বিরাট্ থেকে যদি আমরা আরম্ভ করি তবে দেখতে পাব যে সেই বিরাটের সত্তা বা সত্যও যতটুকু, তার বাধাও ঠিক্ ততটুকু। সে সত্যটাও যেমন তখন পরিস্ফূর্ত্তির পথে চলিয়াছে, তার বাধাটাও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সত্যও বাধাকে অতিক্রম করিতে লাগ্‌ল এবং বাধাও তার নূতন নূতন মূর্ত্তিতে সত্যকে রুখে রুখে দাঁড়াতে লাগ্‌ল, আর হটে হটে যেতে লাগ্‌ল, আবার আসতে লাগ্‌ল, আবার হটতে লাগ্‌ল। এমনি করে বাধা ও সত্যের সংগ্রামে সত্যেরই মহিমা জয়যুক্ত হয়ে উঠতে লাগ্‌ল, তিনিই বহুধা বিচিত্র হয়ে উঠতে লাগলেন।

একটা কোনও বস্তুকে যদি আমরা মনে

মনে বিশ্লেষ করে দেখি তা হলে আমরা দেখতে পাব যে তার মধ্যে সত্তাটা বা প্রকাশটা, যে, তার চারিদিকে কতগুলো বাধা নিয়ে আছে তা স্পষ্টতঃ সেইভাবে আমরা চোখে দেখ্‌তে পাই না। তার হয় ত কোনও একটা রূপ আছে, কতগুলো গুণ আছে, একটা আয়তন আছে, একটা ওজন আছে; ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কত কি আছে, সেই গুলিই আমাদের চোখে পড়ে। এই যে বস্তুটির রূপ, তার গুণ, তার আয়তন, তার পরিমাণ বলে আমরা যা যা বুঝ্‌তে পারচি সেগুলি সবই হোল বস্তুটির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বাধা। দেখ্‌লেই মনে হয় যেন বস্তুটি বুঝি ভিন্ন রকমে বাড়তে চেষ্টা করেছিল, আর তার প্রত্যেক চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আবার চেষ্টার অনুরূপ বাধাও ছিল। বস্তুটি বাধাগুলি অতিক্রম কর্‌তে চেয়ে স্তরে স্তরে যেমনি যেমনি অতিক্রম করেছে, তেমনি তেমনি আবার আবার ঘন ঘন বাধা এসেছে এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বাধার সঙ্গে সঙ্গে ঠেকে ঠেকে বহুধা বিচিত্র হয়ে উঠেছে। যতই কোনও জিনিষকে উত্তরোত্তর বিচিত্র হতে দেখা যায় ততই জানা যায় যে সে বাধার ভিতর দিয়ে তত বেশী

এগিয়েছে। যে যত বাধার ভিতর দিয়ে এগিয়েছে বাধার সঙ্গে বিরোধে বিরোধে তাকে ততই আপনাকে খুলে দিতে হয়েছে, বিচিত্র হতে হয়েছে। সত্য তাঁর নিজেরই দেহের মধ্যে বাধাকে রেখে দিয়েছেন, তাই তিনি সকল সময়েই বাধার সঙ্গে বিরোধে আপনাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। সত্যের স্বভাবই এ নয় যে তিনি কোথাও স্থির হয়ে থাক্‌তে পারেন। তিনি ক্রিয়াস্রোতের পরমার্থ সম্পত্তি, তাই তাকে আমরা যে অবস্থায়ই পেতে চাই না কেন, যে অবস্থায়ই আমরা তাকে স্পর্শ করতে চাই না কেন, আমরা দেখতে পাব যে সেই অবস্থাতেই তাঁর নিজের কাছে নিজের একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে, খানিকটা যেন পেতে বাকী রয়ে গেছে। যদি বল যে তা হোতে পারে না, সত্যের সঞ্চার পথে এমন একটা অবস্থা পাওয়া যেতে পারে যেখানে তার যা কিছু পাওয়া বাকী ছিল তা সমস্ত পাওয়া হয়ে গেছে, তবে আমি বলব যে সে হ'তে পারে না কারণ তাহলে সত্য এসে সেই জায়গায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে যাবে, তাতে তার স্বভাব নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি কোনও খানে এমন একটা অবস্থা

আছে বল্‌তে চাও যেখানে সত্যের যা কিছু পাওয়া বাকী ছিল তা তার পাওয়া হয়ে গেছে তবে সেটা কেবল সত্যের নিজের স্বরূপের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। সত্য সকল থানে সকল প্রকারে কোনও সময়ই নিজকে ছাড়িয়ে যায় না। কারণ তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি ছাড়া যা থাক্‌তে পারে বলে ভাব্‌বে সেটা তাঁর বাধা, তা সে বাধাটাও তাঁর নিজেরই স্বরূপ। তাই সত্য তাঁর সকল রকমের প্রচারের মধ্যে তার নিজের স্বরূপকে ছাড়িয়ে যান না। এই যে জগৎটা তিনি হয়ে রয়েছেন, এ কি উপায়ে? তিনি নিজকে সঙ্কোচ করে করে এক এক জায়গায় এক এক রকম হয়ে রয়েছেন ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে নিজকে বের করেছেন এবং তা হ'তেই জগতের বস্তুজাত এমন বিচিত্র হয়ে রয়েছে। এই যে স্তরে স্তরে নিজকে সঙ্কোচে সঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন, এর প্রত্যেক স্তরেই তাঁর একটা অবস্থা পাওয়া, এবং একটা অবস্থা না পাওয়া ছিল। যেটা না পাওয়া ছিল সেইটার উদ্দেশেই, যেটা পাওয়া ছিল সেটা ছুটেছিল, এবং তখন সেই না—

পাওয়াটাই ছিল তার বাধা। সত্য যখন সেই বাধাটা পার হবার জন্য ছুটল, তখন সেই বাধাটা এসে সত্যেরই শরীরে প্রবেশ করে তাকে পথ ছেড়ে দিল, এবং আবার তখনই সত্যের ভিতর থেকে একটা নূতন আকার নিয়ে এসে তাকে রুখে ধরল এবং আবার সত্যের সঙ্গে তার সঙ্গে সঙ্গম হল। এমনি করে সত্য বিচিত্র হয়ে উঠলেন, মহামহিমময় হয়ে উঠলেন।

এই যে কথাটা বল্লুম, যে সত্য যে কোনও অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সেই অবস্থাতেই তার একটা অলব্ধ আছে, যেটা না কি তখনও তার কাছে লব্ধব্য, এবং যেটা না কি হচ্ছে তার বাধা। এই কথাটা বুঝতে গেলে আমাদিগকে এই দেখতে হবে যে, সেই যিনি পূর্ণ, যিনি অনন্ত, যিনি এই সব খণ্ড এবং ক্ষুদ্র হয়েছেন, তার পক্ষে, এই ক্ষুদ্রগুলি, এই যে আমরা এত অপূর্ণ এবং খণ্ড, আমরাই তাঁর পক্ষে অপ্রাপ্ত আমরাই তাঁর পক্ষে লব্ধব্য তাই তাঁর জীবনের আমরাই বাধা। আমরা তাঁরই মধ্যে ছিলাম এবং তিনি যে এত বেড়ে চলেছেন সেও আমাদেরই শক্তিতে। আমরাই ছিলাম

তাঁর অপ্রাপ্ত, আমরাই ছিলাম তাঁর পক্ষে লব্ধব্য, আমরাই ছিলাম তার অঙ্গের অঙ্গের বাধা স্বরূপে। তাই তিনি বরাবর ছুটতে ছুটতে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ বড়র বড়র মধ্য দিয়া এসে, ক্রমশঃ ছোট হয়ে হয়ে আস্তে লাগলেন। বিরাট হতে আরম্ভ ক'রে ধাপে ধাপে নাবতে নাবতে এসে আমাতে পৌছালেন, ক্ষুদ্র হলেন, খণ্ড হলেন। খণ্ড হয়েই তিনি দেখলেন যে তাঁর পূর্ণের মধ্যে, বিরাটের মধ্যে যে বাধাটা খণ্ডের দিক্ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল, এবং যেটা তাকে এতদিন ক্রমশঃ ক্রমশঃ নাবিয়ে এনে এনে খণ্ডে পৌছে দিয়েছিল, সেই বাধাটাই তাঁর খণ্ডের মধ্যে আবার অনন্তের দিক্ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে এবং খণ্ডকে সর্ব্বদাই অনন্ততে টান্‌ছে। অন্তের কাছে অনন্ত যেমন অনন্ত, অনন্তের কাছেও অন্ত তেমনই অনন্ত। তাই অন্ত যেমন অনন্তের দিকে ছুটে যেতে চায়, অনন্তও তেমনি অন্তের কাছে ছুটে নেবে আসে। আগে অনন্ত ছুটে নেবে এসে অন্ত হয়ে দাঁড়াল, তখন গিয়ে অন্তের জন্ম হল, তারপর অনন্ত আবার তাঁর অনন্তের দিক্ থেকে অন্তকে ডাক্‌তে লাগল, টান্‌তে লাগ্‌ল। তখন অন্ত তার

অভাব, তার দৈন্য, তার অপূর্ণতা বুঝতে পারল। সে মনে করতে লাগল যে আমি যদি অনন্ত থেকেই এসে থাকি তবে আমার মধ্যেও ত সেই অনন্তই রয়েছেন। তবে আমি কেননা অনন্ত হতে পারব, অনন্ত আমাকে হওয়াই চাই, তখন সে প্রাণপণ করে ছোটে। যে অনন্ত থেকে এসেছে সেই অনন্তই তখন তার বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন সে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই বাধাকে অতিক্রম করে অনন্তের মধ্যে ফিরে যায়, এবং এই যাতায়াতের দ্বারাই অনন্ত তাঁর নিজের স্বরূপকে নিজের মধ্যে লাভ করেন।

এখন একটা কথা বলতে হয় এই, যে, ভূমা যখন ক্রমশঃ ছোটর মধ্য দিয়া এসে একেবারে ছোটতে পৌছিল, সে পর্য্যন্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের একটা মোটামুটী বিবরণ আমাদের আন্দাজ করে নিতে হবে। ভূমার বিকাশের কোনও একটা জায়গা ধর humanity বা মানবজাতি। এখন এই মানব-জাতির মধ্যে যে সত্যটা নিভৃত হয়ে রয়েছে, মানব সমাজের মধ্যে তার একটা বাধা লুক্কায়িত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ যেই আমরা শুনিলাম যে মানব-জাতি বলে একটা সত্য ফুটেছে, সেই ফোটার

সঙ্গে সঙ্গে এটাও ফুটে উঠে যে সেই মানবজাতিটা মানব সমাজ নয়। যতই বড়র দিকে যাবে ততই দেখ্‌বে যেন সেটা ক্রমশঃ তোমার কাছে একটু একটু অস্পষ্ট বলে মনে হবে, আর যেই একটু একটু করে নেমে আস্‌বে সেই দেখ্‌বে যে ক্রমশঃ সব স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। যতক্ষণ মানবজাতির মধ্যে ভাবা যাইতেছিল ততক্ষণ যেন সেটা কিছুই বুঝিতেছিলাম না। যেই সমাজের মধ্যে এলেম সেই দেখলাম্ যে হাঁ এ জিনিষটা অনেকটা বোঝা যায় বটে। এইরূপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমরা যখন এসে ব্যক্তিতে পড়্‌লাম, তখন দেখলাম যে তার মধ্যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সবই স্পষ্ট হয়ে আসছে। মানবজাতির মধ্য দিয়া সে যখন ফুটে উঠ্‌ছিল, সে যেন মনে করেছিল, যে সে যে কি পদার্থ তা যেন সে বুঝিয়ে উঠতে পারে নাই। সে জানিয়ে দিতে পারে নাই যে সে কি। তাহার মধ্যে যে সত্যটি লুকিয়েছিল সেটা যে সত্য, তার যে প্রসার সমস্ত বিশ্ব বেপে রয়েছে তা সে মোটেই বোঝাতে পারছিল না। তাই সে ক্রমশঃ তার মধ্যে যেটা অস্পষ্ট ছিল, যেটা সঙ্কুচিত ছিল, যেটা বাধা ছিল, সেটাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ফোটাতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল,

এবং একটু একটু করে ফোটাতেও লাগ্‌ল, এবং তার চেষ্টার ফলেই সমাজ জেগে উঠ্‌ল; সমাজের অঙ্গে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মানব সম্প্রদায় ফুটে উঠ্‌ল; এবং তার মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যক্তিজীবনগুলি জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সেই বিরাটই ক্রমশঃ প্রসারিত হতে হতে ক্ষুদ্রে এসে পৌঁছেচেন। কারণ বিরাটের আর বিরাটের দিকে ত বাড়বার কোনও উপায় নাই। তাঁর যত সঙ্কোচ, যত বাধা, সে সবই হচ্ছে ক্ষুদ্রের দিকে। বিরাট্ ত বিরাট্ হয়েই আছে, তার যা কিছু বাকী সে হচ্ছে ক্ষুদ্রের দিকে। বিরাট্‌কে যদি বাড়তে হয় ত তাকে সেই ক্ষুদ্রের দিকেই বাড়্‌তে হবে। সেই দিকেই তার যত সঙ্কোচ। তাই সত্য ব্রহ্ম যখন দেখ্‌লেন যে, তিনি সেই এক বৃহৎই হয়ে আছেন, সেদিকে আর এগুবার কোনও পথ নাই, তখন তিনি ভেঙ্গে দ্বিধা হলেন। তদৈক্ষত বহুস্যাম্। এমনি করে নিজকে আরও আরও ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রেতে, ব্যক্তিতে এসে পৌঁছেচেন। এই যে একটার পর আর একটা এসেছে, এগুলোকে যেন সব আলাদা আলাদা মনে করা না হয়। এরা সব ছাড়া ছাড়া নয়, এদের মধ্যে পরস্পরের খুব একটা গাঢ় সম্বন্ধ আছে। এরা

সকলেই একই সত্যের প্রকাশ। যেটা সঙ্কুচিত ছিল সেটাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্ফুটতর হয়ে উঠ্‌ছে; স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌ছে। কাজেই একটার পর যে আর একটা বিকাশ আসছে, সেটা তারই বিকাশ, একটা আলাদা কিছু নয়; একটা অবস্থার মধ্যে যেটা খুব স্পষ্ট ছিলনা, খুব স্ফুট ছিলনা, আর একটা অবস্থার মধ্যে সেইটেই স্ফুট হয়ে হয়ে উঠ্‌ছে। যেমন একটা বীজ থেকে ক্রমে ক্রমে গাছ হয়, তখন এটা আমাদিগকে বুঝতে হয় যে এই গাছের যত তাৎপর্য্য সমস্তই বীজের মধ্যে ছিল। বীজের পর অঙ্কুর, অঙ্কুরের পর চারা ইত্যাদি যত যত অবস্থা, তারা সব আলাদা নয়, একই বীজের ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিকাশ এবং প্রকাশ; এক বীজের মধ্যেই সমস্ত অবস্থাগুলি সঙ্কুচিত হয়ে ছিল, ক্রমশঃ ক্রমশঃ সঙ্কোচগুলো সরে যেতে লাগ্‌ল এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা গুলি বেরিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। বীজটাই ক্রমশঃ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বহু হয়ে, প্রসারিত হয়ে, বিচিত্র হয়ে, নিজকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ছে যে সে এক। তেমনি যখন বল্‌লাম যে মানবজাতির সত্যটা তাকে ভেঙ্গে ক্রমশঃ সমাজ, জাতি, সম্প্রদায় এবং ব্যক্তির

মধ্যদিয়ে প্রকাশ করছে, তখন যেন আমরা না বুঝি যে সমাজ, জাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতি যেগুলির নাম করা গেল, সেগুলি মানবজাতি ছাড়া আর কিছু বা মানব-জাতির থেকে ভিন্ন। মানবজাতির মধ্যে নিভৃতে যে সত্যটা ছিল, যেটি না কি শুধু মানবজাতি বল্লে আমরা বুঝতাম না, সেই সত্যটিই তাকে ফুটিয়ে উঠিয়ে বহু করেছে। বহু করার জন্য, ক্রমশঃ বিকাশের জন্য, আপনাকে একবার সমাজ বলে বুঝিয়েছে, একবার জাতি বলে বুঝিয়েছে, একবার সম্প্রদায় বলে বুঝিয়েছে, একবার হয় ত ব্যক্তি বলে বুঝিয়েছে। মানবজাতির সামনে যে লক্ষ্যটি ছিল, এদেরও সামনে কাযে কাযেই সেই একই লক্ষ্য রয়েছে এবং সেই একই লক্ষ্য এদের সকলের মধ্য দিয়ে বহুধা বিভিন্ন হয়ে ফুটে উঠছে। মানবজাতিটি, যেটা থেকে আমরা রওয়ানা হয়ে এলুম, সেটির মধ্যে যে সত্য ছিল, সেইটাকেই ফোটাতে এরা চেষ্টা করছে এবং এরা এসেছেও এই জন্যেই; তাই এদের সকলের সামনেই সেই লক্ষ্য রয়েছে। এরা ভিন্ন হয়ে মানবজাতি থেকে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তাকেই বুঝিয়ে দিবে, আবার ঘুরে তাতেই যাবে।

সত্যের স্বভাবই এই যে তিনি ফুটতে ফুটতে, বাড়তে বাড়তে, ঘুরে আবার তাঁতেই ফিরে এসে দেখিয়ে দেন যে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই; যেখানেই যাও সেই থানেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। তাই বলছিলাম মানবজাতিটির মধ্যে যে লক্ষ্যটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সমাজের জীবনেও সেই লক্ষ্যটি দাঁড়িয়ে আছে এবং সেইটেই কাজ করছে। সমাজ যে ফুটছে, সমাজ যে চলছে, তার জীবনীশক্তি এর মধ্যেই রয়ে গেছে। এরই জোরে সমাজ ছোটে। তাই যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, সমাজ-জীবনের কর্ত্তব্য কি? তবে বল্‌তে হবে যে মানবজাতির ভিতরকার সত্যটিকে ফুটিয়ে তোলাই তার কর্ত্তব্য; কারণ সেইটেই সে কর্‌চে। কর্ত্তব্য মানে, যেটা কর্‌তে হবে। কি কর্‌তে হবে? যেটা কর্‌চ অথচ করা হয় নাই; যেটা তোমার পক্ষে করা স্বাভাবিক। অনেক সময়ে অনেকে হয়ত বলবেন যে, সেইটাকেই কর্ত্তব্য বল্‌ব, যেটা হচ্চে উচিত। কিন্তু উচিত বল্‌তে কি বুঝি? যেটা স্বাভাবিক সেইটাই ত হচ্চে উচিত। কে একথা বলবে যে যেটা স্বাভাবিক নয় সেইটেই হচ্চে উচিত? যেটা

স্বাভাবিক নয় সেটা ত হবেই না, কারণ স্বভাব ত কখন ওলটাতে পারে না। "স্বভাবনাশাৎ স্বরূপ-নাশপ্রসঙ্গঃ"। স্বভাব ওলটাতে গেলে বস্তুটাই উল্টে যায়। তাই স্বভাব যেটা, সেটা হবেই হবে, এবং কাযে কাযেই উচিত হতেও, সেইটেই হতে পারে। তাই যখন বলি সমাজের কর্ত্তব্য, তখন বুঝব, যে যেটা সমাজ করছে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সকল সময় সে যেটা করছে বা যেটা করতে হচ্ছে। সমাজ কি করছে, কিসের জন্য সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কি তার লক্ষ্য, কোন্‌দিকে তার গতি, যদি ভেবে দেখি তা হলে বুঝ্‌তে পারব যে মানবজাতির মধ্যে যে সত্যটা ছিল, যে কল্যাণটা ছিল, সেইটেই হচ্ছে তার লক্ষ্য, সেইটেই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য, সেই দিকেই সে ছুটে চলেছে। এক মানবজাতিই নিজের তত্ত্বটাকে বোঝাবার জন্য নানা সমাজে বিভক্ত হয়েছেন। কাযেই সকলকে তাঁরই অভিব্যক্তি বোঝাবার জন্য চেষ্টা কর্‌তে হবে। কর্ত্তব্যটা কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; এখানে ইচ্ছা থাক্‌ বা না থাক্‌ কর্‌তেই হবে, বাধ্য করে করাবে।

সকল সমাজ মিলে মানবজাতির তত্ত্বটাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বোঝাবে। সকলের মধ্যে যে স্বাধীনতাটা দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেটাও তাঁরই সত্যের প্রকাশের একটি অঙ্গ। তাই আপাততঃ হয়ত দেখ্‌তে পারি যে মানবজাতির মধ্যে যে বাধাটা ছিল, যেটার জন্য সে ভাল করে ফুট্‌তে পারে নাই, যেটার জন্য তার নিজের দেহটাকে এত বিভক্ত করে নিজকে ফোটাতে হচ্ছে, সেই বাধাটা হয়ত কোনও সমাজের মধ্যে বেশী রকম বেরিয়ে পড়্‌ল, সে হয়ত সত্যের মানকে, তাঁর বিকাশকে, রুখে দাঁড়াতে এল, তখন বুঝতে হবে যে সেই সমাজের তখন পাপ হল। সে তাঁকে রুখ্‌তে গেল। কিন্তু তা কি রুখ্‌তে পারে? সে যে হয়েছেই তাঁকে সাহায্য করতে, তাকে তার সাহায্য করতেই হবে; কিন্তু সে যে রুখে দাঁড়াল, তাকে দিয়ে সাহায্য হবে কেমন করে, বরং প্রতিকূলতাই হতে চলিল। কিন্তু তা ত হবার যো নাই। সে কি করে তাঁর প্রতিকূলতা করবে? তাইত হয় তার রোখ কমে যাবে, সে তার ভুল বুঝ্‌তে পারবে এবং তাঁর পথে চল্‌বে; নয় তার শক্তি কমে যাবে, সে দুর্ব্বল হয়ে যাবে তার অধঃপতন হবে।

তখন তার বল কমে যাওয়াতে, তার রোখে আর তাঁর যানের কোনও ক্ষতি হবে না। আর যারা তাঁর যান, তাঁর অভিপ্রায় মেনে নিয়েছে, তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে জীবন বেঁধে দিয়েছে, তাদের বল বেড়ে উঠবে, আর সেই বর্দ্ধিত বলের সাম্‌নে যারা তাঁকে রুখ্‌তে গিয়েছিল, তারা দুর্ব্বল হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়্‌বে। সত্যকে বাধা দিলেই তার সাজা আছে, এবং সে সাজা কাউকে বসে গবেষণা করে বিধান কর্‌তে হয় না; সত্যের নিজের নিয়মেই সে সাজার বিধান হয়ে যায়। সত্যের সঙ্গে সকলকে মিলিয়ে চল্‌তে হবেই। যিনি ইচ্ছা করে সত্যের ইচ্ছার সঙ্গে, তাঁর কাযের সঙ্গে, তার গতির সঙ্গে নিজকে মিশিয়ে দিবেন, মিলিয়ে দিবেন, তাঁর আর কোন দুঃখ, কষ্ট নেই, কোনও সাজাও নাই। বেশ অনায়াসে তিনি চলিয়া যাইবেন। আর যিনি তাহাকে বাধা দিতে আসিবেন, তিনি ত বাধা দিয়া রাখিতে পারিবেনই না, বরং তাঁর নিজের হাড় চুরমার হয়ে যাবে। তিনি যদি দাড়িয়ে উঠে সত্যকে সাহায্য কর্‌তে না পারেন, তবে সত্য তাঁকে পেড়ে ফেলে তার উপর দিয়ে তাঁর গাড়ী হাকিয়ে যাবে.

আর, ফলে তার হাড় গোড় গুলো চূর্ণমার হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম যে, কোনও সমাজ যদি মানবজাতের মধ্যে যে তত্ত্বটি নিগূঢ়ভাবে অন্যান্য সমাজের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেটির বিরুদ্ধাচরণ করে, বা সেটিকে চাপিয়া রাখিতে চায়, বা তার প্রসারকে রোধ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে হটিয়া যাইতে হইবে, তাহাকে অধঃপতিত হইতে হইবে, এবং যাহার গতি বাস্তবিক সত্যের গতিকে সাহায্য করিতেছে তাহার কাছে পদদলিত হইতে হইবে। সেই জন্য আমরা অনেক সময় দেখি যে, পূর্ব্বে যে সমস্ত সমাজ খুব বড় ছিল, সেগুলি অনেক সময়ে কালক্রমে অধঃপতিত হইয়া যায়। কেন যায় সেটা যদি আমরা বাস্তবিক বুঝ্‌তে চেষ্টা করি, তবে দেখ্‌তে পাব যে পৃথিবীর সকল সমাজগুলি কখনও আমরা এক সময়ে তুল্যরূপে উন্নত দেখি নাই। এক সময়ে হয়ত কতকগুলা খুব উন্নত হয়ে আছে, এবং আর কতকগুলা হয়ত খুবই নীচু হয়ে আছে। এত গুলা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আবশ্যকতা কি তা যদি আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাইব, যে

তারা যেন সব ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব, এবং তাদের এক একটি অবয়ব দিয়ে সত্যের এক একটি শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। একটি শক্তি যখন একটি অবয়ব দিয়ে ফুটে বাহির হোল, তখন অপর অবয়ব গুলির মধ্যে দিয়ে সে শক্তির কোনও সাহায্য হইতেছে না, (কারণ তাহাদের মধ্য দিয়ে পরে অন্যবিধ শক্তি আবির্ভূত হবে এবং অন্যবিধ উপায়ে তাহারা সত্যের মহাযানের সাহায্য করিবে), তাই তারা তখন দুর্ব্বল এবং নীচু হয়ে থাকে, আর তখন যাদের দ্বারা সত্য বাস্তবিক স্বার্থক হচ্ছিল, তারা বলীয়ান্ হয়ে উঠে। কালক্রমে যখন সত্যের যে দিক্‌টি ফুটে উঠ্‌ছিল, সেটা ছাড়া আরও কোনও দিকে তাঁর ফোটবার আবশ্যক হয়, তখন হয়ত অন্য সমাজ গুলোতে সে দিক্‌টা ফোটাবার সাহায্য হয়, সত্য সেই দিক্ দিয়ে ফুটে উঠেন ; আর যে গুলো দিয়ে পূর্ব্বে ফুটছিলেন, সে গুলো সত্যের এই নূতন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকে বদ্‌লাতে পারে না কাযেই তারা নীচু হয়ে পড়ে, আর তাদের উপর দিয়ে দলিয়ে গিয়ে নূতনেরা জয়লাভ করে। যদি পূর্ব্বের পূর্ব্বের সমাজগুলি ঠিক সত্যকে ধরতে পেরে, তাঁর সঙ্গে

নিজেদেরকে মিশিয়ে দিতে পারৃত, তা হলে তারা সত্যের সঙ্গে সঙ্গে, নিজেদেরকে পরিবর্ত্তনও কর্‌তে পার্‌ত। সত্যের সঙ্গে যদি মিশিয়ে দিতে পার্‌ত, তা হলে নিজেদের ইচ্ছামত কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তনা, কোনওটাকে নিজস্ব মনে করে সেটাকেই খুব বেশী মায়া করে ধরে রাখ্‌তনা, সত্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকে ছেড়ে দিত, কাজেই তাদের অধঃপতনও হতে পার্‌তনা। সত্যের যখন কোনও বিকাশ তাদের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছিল, তখন সত্যেরই গৌরবে মহীয়ান হয়েও তারা হয়ত বুঝ্‌তেই পার্‌লে না যে তা সত্যেরই গৌরব, তাই তারা সেই গৌরবটাকে নিজের বলে মনে কর্‌লে; এবং সত্য যখন তাঁর নূতন রকম বিকাশ নিয়ে আর একদিকে ফুট্‌তে লাগলেন, তখন তারা তাকে সত্যেরই বিকাশ বলে হয়ত চিনিতেই পারিল না; তাই তারা তাঁর গতিরোধ কর্‌তে গেল, এবং নিজের সত্যের এই নূতন আহ্বানের দিকে একটুও দৃষ্টিপাত করিলনা, কাঠ হয়ে তারা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে রহিল। তারা ভাব্‌ল আমরা উন্নত, এই

যেটায় আমরা আছি, যেটা হচ্ছে আমাদের উন্নতি, এটা আমাদেরই নিজস্ব। এই হোল তাদের অহঙ্কার। এই হোল তাদের মিথ্যা। এই মিথ্যা দিয়ে তারা সত্যকে বাধা দিতে গেল। সত্যের নূতন আহ্বানের দিকে একটু নজরও করলেনা। তাই তারা সত্যের নিয়মে পড়ে গেল; আর নূতনের কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তি আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া উঠিল।

এই যেমন সমাজের কথা বলা গেল, ব্যক্তি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলিতে হইবে। ব্যক্তি হচ্ছে সমাজ-জীবনের প্রকাশ। সমাজ আপনার মধ্যে আপনি প্রকাশ হতে পারছিল না, তাই বহুধা বিভিন্ন হয়ে ব্যক্তি হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করতে লাগল। সমাজের মধ্যে যেটা সঙ্কুচিত ছিল, ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে সেইটেই প্রকাশ করে নিজে পরিস্ফুট হবার চেষ্টা করিল। যে সত্যটি সমাজ জীবনের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই সত্যটিই ব্যক্তির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সমাজ জীবনের মধ্যে যে সত্যটি নিভৃত হইয়াছিল, তাহা যেন নিজকে ঠিক করিয়া বুঝাইবার

জন্যই পুনঃরায় পরিস্ফুট হইয়া, ব্যক্তি হইয়া দেখা দিল। কাযেই সমাজ-জীবনের সত্যকে উঁচু করিয়া ধরা, তাকেই ফুটাইয়া উঠাইবার চেষ্টা করাই ব্যক্তি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। ব্যক্তি সর্ব্বদা তার লক্ষ্যের মধ্যে সমাজ-জীবনকেই দেখিতেছে। মহান্ সত্য তার কাছে সমাজ জীবনের মধ্য দিয়াই আসিতেছে, এবং সেও মহান্ সত্যকে সমাজ জীবনের মধ্য দিয়াই স্বার্থক করিয়া চলিতেছে। সমাজ জীবন ছাড়া তার কোনও প্রাণ নাই। সে তাহার বুকের মধ্যে যে রণন লাভ করিতেছে, তাহা সমাজেরই অনুরণন। যে মহান্ সত্যকে আমরা মানবজাতির মধ্যে দেখিয়াছি, সেই মহান্ সত্যই সমাজের মধ্য দিয়া আমার মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে, এবং সার্থকতা লাভ করিতেছে। সমাজ পালন করিতে যাইয়া আমি সেই মানবীয় মহাসত্যকেই পালন করিতেছি। সমাজকে বাধা দিতে গেলে আমি সেই মহান্ সত্যকেই বাধা দিতে গেলাম, তাই সেই মহান্ সত্যের বলে, সমাজ আমাকে শাস্তি দিবে। যে বাণী সমাজের

মধ্যদিয়া আমার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে সেই বাণীকে মানিয়া চলাই আমার কর্ত্তব্য; সেই বাণীর সঙ্গে আমাকে মিশাইয়া দিলেই, মিলাইয়া দিলেই আমার সার্থকতা। সমাজের বাণী আমার মধ্য দিয়া সর্ব্বদা ধ্বনিত হইয়া আমাকে সর্ব্বদা আমার পথ দেখাইয়া দিতেছে, আমাকে সর্ব্বদা পথ মিলাইয়া লইতে বলিতেছে, আমাকে সর্ব্বদা বলিয়া দিতেছে, এই সত্যের উদ্দেশ্য, এই সমাজের গতি। আমি যদি সে গতির সহিত আমাকে না মিশাই, তবে সে আমার সত্যকেই রোধ করা হইবে, এবং সত্যকে রোধ করিলে যে সাজা হয় তাহা হইতেও আমি অব্যাহতি পাইব না। সমাজের গতি আমি রোধ করিতে গেলে আমিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, আর সমগ্র বলবান্ সমাজ সতেজে আমার বুকের পাঁজরের উপর দিয়া জগন্নাথের মহারথ, মহাঘোষে, মহোল্লাসে টানিয়া লইয়া যাইবে, আর চারিদিকের বংশীধ্বনির সহিত আমার রোদন ধ্বনি তার ক্ষীণ সুর মিলাইয়া দিবে। চারিদিকের গগনস্পর্শী ধূলিপটলের এক মুষ্টি ধূলি, হয়ত, আমার রক্তে আর অশ্রুজলে

সিক্ত হইয়া জগন্নাথের রথচক্রের পাদ-সম্বৰ্দ্ধনা করিবে। আমি কে? আমি ত সমাজ-জীবনের অনুরণন মাত্র সমাজ জীবনের কাষ তার নিয়ত গতিতে চলিয়াছে। সমাজ দেবতা যে ভাবে চলিবেন, যে নিয়মানুসারে তাঁর গতি তিনি ঘুরাইবেন, যে অনুসারে তাঁহার মতাযান তিনি প্রবর্ত্তিত করিবেন, তাহা তাঁহারই হৃদয়ের মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে। তাঁহার বুকের মধ্যে আমার বুক রহিয়াছে, তাই তাঁহার বুকের পরিস্পন্দন আসিয়া আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া প্রতি কার্য্যের সময় আমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। আমরা চলিত কথায় যাহাকে বিবেক বলি সেটা কি? সেটা কেবল সেই সমাজ জীবনের অনুরণন মাত্র। সমাজের প্রতি অবয়বের মধ্যে সে ধ্বনি স্পন্দিত হচ্ছে, এবং আমাদিগকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, কোন্ দিকে আমাদের যেতে হবে। এই অনুরণনের মূলে দেখতে পাব যে একটা সার্ব্বভৌম ভাব লুকানো রয়েছে। এত যে মুটে, এত যে চাষা, কিছুমাত্র লেখাপড়া শেখেনি, উহাকে জিজ্ঞাসা

কর, এটা করা ভাল কি মন্দ; জিজ্ঞাসা কর, চুরি করা উচিত কিনা, দেখিও ও তোমাকে ঠিক্ উত্তর দিয়া দিবে। তুমিও যেমন বোঝ চুরি করা পাপ, ও লোকটিও ঠিক্ তেম্‌নি করে বোঝে যে চুরি করা খারাপ। কেমন করিয়া বল্‌তে পারে? ও ত তোমার মতন কোনও শিক্ষা পায় নাই। তবে কেমন করিয়া বলে? তাইত বলি, যে একথা বলবার জন্য উহার কোনও বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন হয় নাই। সমাজই তাহাকে তাহার আকাশে, বায়ুতে, জলে তাহাকে শিখাইয়াছে। সমাজে জন্ম গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, সমাজ তাহাকে সমাজ-গতি নির্ণয় করিয়া তাহার সহিত তাহার নিজকে মিলাইয়া লইবার উপায় শিখাইয়া দিয়াছেন। তাই তার এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হয়ত, ঘটনাটা গোলমেলে রকমের হোলে, বুদ্ধি দ্বারা ঠিক্ করতে পারে না, যে কি ঘটনাটা ঘটে ছিল এবং কোন্ দিকে কি বলবার আছে; কিন্তু সেটা একবার ঠিক্ হোয়ে গেলে, উচিত অনুচিতটা ঠিক্ হোতে তার আর দেরী লাগে না। এটা হচ্ছে সত্যের বাণী

সমাজের ভিতর দিয়ে তাকে স্পর্শ করছে এবং সমাজের ভিতর দিয়ে, তার মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে চলেছে। কাযেই ইহা সার্ব্বভৌম, এবং ইহাকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন না। ইনি সকলের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে বলে দিচ্ছেন, যে সত্যের এই পথ, এই পথে চল, এদিক্ ওদিক্ বাঁকিয়া চলিলেই তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইতেছে এবং সেইজন্য সাজাও পাইবে। সত্যের এই বাণীর ভিতর দিয়ে প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে হৃদয়ে সত্যের বিশ্বজনীন নিয়মের মঙ্গল-জ্যোতি স্ফুরিত হয়ে উঠ্‌ছে, আর মানুষকে আহ্বান করছে, এই দিকে এস, এই দিকে এস। সত্যপ্রাণ মহামতি Kant, সত্যের এই বাণী উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যে এই যে মানুষের প্রাণের মধ্যে কি জেগে ওঠে, কি পরিস্পন্দিত হতে থাকে, কি যেন তাকে জোরে বলে দেয়, এই দিকে এস, এই দিকে, এই দিক,—এ সত্যেরই বাণী। এই যে কি এক ঝঙ্কার সকল মানুষের মধ্যে জেগে উঠে, তালে তালে বেজে ওঠে, মানুষকে সত্যের পথে কল্যাণের পথে

ধাবিত করে, ইহা সত্যেরই মহাবাণী। আর কিছুকে মানলেই আমাদের পরমার্থ লাভ হবেনা, আমাদের কর্ত্তব্য করাও হবেনা। এই সত্যের নিয়মকেই আমাদের প্রাণের প্রাণ করে রাখতে হবে, এরই নির্দ্দেশ অনুসারে আমাদিগকে চলতে হবে।

ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রত্যেক মানুষ মনে করিত যে তার ব্যক্তিগত বুদ্ধি, বিদ্যা, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ ছাড়া সংসারে খুব বড় সার বা সত্য বলে কোনও জিনিষ নাই। রাজাকে কাটিয়া ফেলিয়া তাহারা দেশে অরাজকতা আনিল, বিপ্লব ও অশান্তিতে দেশ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিশক্তি ছাড়া, অন্য সমস্ত শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবে, এই ছিল তাদের অভিপ্রায়। ব্যক্তিশক্তি ও রাজশক্তির কোনও সামঞ্জস্য না করিয়া, শুধু রাজশক্তি ধ্বংস করিয়া সেই আসনে ব্যক্তিশক্তিকে বসাইতে উদ্যোগী হইল। ব্যক্তিশক্তিকে শাসন করিতে পারে এমন কোনও শক্তিকেই তাহারা স্বীকার করিতে চাহিল না। শুধু মুহূর্ত্তের তীব্র আঘাতে অন্য সমস্ত শক্তিকে ধূলিসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই আঘাতের বল অনেক দিন থেকেই

বিপুল ভাবে তাদের মধ্যে সঞ্চিত হইতেছিল। কত অত্যাচার তাহারা কতকাল হইতে সহিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এতদিনের সঞ্চিত এত বড় বিপুল শক্তি দ্বারাও তারা রাজশক্তি সমূলে উৎপাটন করিতে পারিল না। যত দিন আপন স্বাভাবিক পরিণতিতে অন্য কোনও বিপুল সমাজশক্তি রাজশক্তির স্থান অধিকার করিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত জোর করিয়া কোনও শক্তিকেই কেহ উৎপাটন করিতে পারেনা। ব্যক্তিশক্তি এই রাষ্ট্রশক্তির স্বাভাবিক পরিণতিতে সাহায্য করিতে পারে মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি স্বকীয় পরিণামে রূপান্তর পরিগ্রহ না করিলে, তাহাকে ধ্বংস করা বা উৎপাটন করা মানুষের সাধ্যাতীত। কারণ ব্যক্তির মধ্যে যে শক্তির লীলা চলিতেছে, তাহা যেমন সত্যেরই বিকাশ, সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে যে শক্তি চলিতেছে তাহাও সেই একই সত্যের বিকাশ। সত্যের গতিরোধ করা বা তাহাকে উৎপাটন করা ধারণারও অতীত। সত্য তেমন বস্তুই নয় যে তিনি মুখের দাপটেই কোথাও সরে যাবেন, তাই তাদের মানিয়ে দেবার জন্য তাহারা তাদের এই ব্যক্তি

সর্ব্বস্বাদ বা Individualismএর উন্নতির পথে যাকে নেতা বলে স্থির করেছিল সেই নেপোলিয়ন তাহাদের রাজা হইয়া পড়িলেন। তাঁর যাওয়ার পরও সেই রাজশক্তিকে তাদের স্বীকার করতে হোল। কিছুকাল পরে তাদের দেশ থেকেই Sociologyর আদি বাণী কোঁতের মুখ থেকে ধ্বনিত হোল। তিনি সমাজকে দেবতা বলে স্বীকার করলেন: তিনি বল্লেন আমি আর কোনও দেবতা মানিনা Humanity is my God। তিনি বল্লেন এ কথা আমার আগে কেউ প্রচার করে নাই; এ দেবতার পূজা আমিই প্রথম প্রবর্ত্তন করলাম্। আমিই এর High priest। সত্যের ইতিহাসের দিক্ থেকে দেখতে গেলে এই সোসিয়লজির প্রতিষ্ঠাই, রাজশক্তির, সমাজশক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠা বা Republicanismএর যথার্থ আবির্ভাবের সূচক। এর পূর্ব্বে প্রজাতন্ত্রশাসনের যে উদ্যোগ হয়েছিল তাহা এই পরিণতির চেষ্টা বা আন্দোলনেরই পরিচায়ক, ইহার প্রতিষ্ঠার প্রমাপক নয়।

ফরাসী বিপ্লবে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একমাত্র সত্য মনে করিয়া তাহার নিকট আর সমস্ত উৎসর্গ

করিবার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একমাত্র সত্য বলিয়া মানাতে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহার তখনই যথার্থ অবসান হইল, যখন এই স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বিশ্বব্যাপক মানবজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ব্যক্তির দিক্ থেকে সত্যকে দেখা হয়েছিল বলেই, সেটা সমগ্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হোল এবং কোঁতের "সোসিয়লজি" বা সমাজ তত্ত্বের সৃষ্টি হোল। সত্যের কোনও একটি রূপকে একান্ত সত্য বলিয়া মানিতে গেলেই, রূপান্তরের দিক্ থেকে তার যে একটা বাধা আছে, তার বলে প্রথম রূপটি সরিয়া গিয়া তার দ্বিতীয় রূপের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দ্বিতীয় রূপটি প্রতিষ্ঠিত হইলে আবার সত্যের তৃতীয় মূর্ত্তি আসিয়া দ্বিতীয় মূর্ত্তিকে স্থানচ্যুত করিয়া দেয়। এমনি করিয়াই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন মূর্ত্তির স্বগত বাধায় সত্যের বিবিধ মূর্ত্তির সহিত আমরা পরিচিত হই।

এই ফরাসী বিপ্লবের যুগে ব্যক্তিত্বের মুক্তিতে যে সত্য আবির্ভূত হইতেছিল, জার্ম্মাণিতে কাণ্টের মধ্যে তাহারই একটি নূতন ছায়া দেখিতে পাই। রুসো ও

হিউমের মধ্যেই কাণ্টের বীজ নিহিত ছিল। রুসো সমাজের দিক্ থেকে বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তিস্বাধীনতার চেয়ে আর কোনও বড় বস্তু নাই। যে কথা রুসো রাষ্ট্রের দিক্ দিয়া বলিয়াছিলেন হিউমও সেই কথাই, প্রত্যয়ের দিক্ দিয়া দেখাইতে গিয়া বলিলেন যে, প্রত্যক্ষই বল আর অনুমানাদি প্রত্যয় সমূহের কথাই বল, সবদিকেই আমাদের মনকেই আমরা প্রধান ভাবে দেখিতে পাই। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধই বল, আর যাই বল, কিছুইত বাহিরে নাই সমস্তই আমার মন থেকে দেওয়া। ঝড় উঠিল, গাছ পড়িল, কিন্তু ঝড়ই যে গাছ ফেলার কারণ তাহাত আমরা দেখিতে পাইনা। এইরূপ অবস্থার একটা যে আর একটার কারণ তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। সেটুকু আমরা কেমন একটা সাহচর্য্য বা অভ্যাসের ফলে জাগতিক ব্যাপার যুগলের উপর আরোপ করি। কাযেই আমাদের মনের সাহায্যে আমরা যে সমস্ত প্রত্যয়ে উপনীত হই সেগুলির তদতিরিক্ত কোনও বাহ্যসত্তা নাই। "Our conviction of the truth of a fact rests on feeling, memory and the reasonings

founded on the causal connection *i. e.* on the relation of cause and effect. The knowledge of this relation is not attained by reasonings a priori, but arises entirely from experience, and we draw inferences, since we expect similar results to follow from similar causes, by reason of the principle of the custom or habit of conjoining different manifestations *i. e.* by reason of the principle of the association of ideas. Hence there is no knowledge, no metaphysics beyond experience."

লক্ যখন বলিয়াছিলেন যে কার্য্যকারণের নিয়ত সম্বন্ধ জ্ঞান আমাদের প্রত্যয় হইতেই উৎপন্ন হয়, তখনও তিনি প্রায় এই একই কথা বলিয়াছিলেন। এই সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে আমরা কেবল দেখিতে পাই যে বহির্জগতে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে সেখান হইতে তাহাকে অন্তর্জগতের দিকে ক্রমশঃ টানিয়া আনা হইতেছে। বার্কলে, লক্, রুসো হিউম্, সকলেরই ঝোঁক্ সেই একই দিকে।

লোকের মনে একটা সন্দেহ (scepticism) ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইতেছে যে সত্যের বাস্তবিক প্রতিষ্ঠা কোথায়? বাহিরে না ভিতরে? এবং এই সন্দেহের ফলে সকলেই যেন সত্যের অন্তর্মূর্ত্তিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার বহির্মূর্ত্তিকে অসৎ বলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। রাষ্ট্রের দিক্ দিয়া এই ঠেলিয়া ফেলার উদ্যোগে ফরাসী-বিপ্লব ও দার্শনিকতত্ত্বচিন্তার মধ্যে ইহার উদ্যোগে লক্, হিউম্, কাণ্ট প্রভৃতির সৃষ্টি।

কিন্তু কাণ্টের মধ্যে ইহা যত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল এত আর কাহারও মধ্যেই নয়। কাণ্ট প্রত্যক্ষ প্রত্যয় (experience) বিশ্লেষ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তিনটা স্বতন্ত্র ভাগ আছে। প্রথমটা ইন্দ্রিয়গোচর বা (Æsthetic) দ্বিতীয়টি বুদ্ধিগোচর (Understanding) তৃতীয়টি চৈতন্যগোচর (Reason)। প্রথমটির মধ্যে, দিক্, কালাদি ও বাহ্যবস্তু সম্পর্কিত রূপ, রসাদি, প্রভৃতি সমুদয় প্রতীয়মান ধর্ম্ম সংগৃহীত রহিয়াছে। দ্বিতীয়টির মধ্যে অন্বয়িত্ব, ব্যতিরেকিত্ব

প্রভৃতি পুরস্কারে ইন্দ্রিয়বৃত্তিলব্ধ সামগ্রী বিভিন্ন প্রকারে সাজান্ এবং গ্রথিত হইয়া নিত্যানুস্যূত আমিত্ববোধের সহিত এক হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তৃতীয়টির মধ্যে দেখা যায়, যে, সেখানে বাহ্যজগৎ, আত্মা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন অনেকগুলি ধারণা রহিয়াছে যাহা ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ জ্ঞাতার প্রত্যয়সঞ্চয় খুঁজিয়া দেখিলে এ গুলির সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধারণাগুলি সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না, কারণ সে স্তরের বিচার করিতে গেলেই নানা স্ববিরোধ উপস্থিত হয়। শুধু এই টুকু মাত্র বলা যায় যে, যখন এই নূতন ধারণাগুলি, কি ইন্দ্রিয় বৃত্তি, কি বুদ্ধিবৃত্তি, কাহারই বিষয় নয়, অথচ এগুলি যে আমাদের মনের মধ্যে রহিয়াছে সে সম্বন্ধেও যখন কোনও সন্দেহ নাই তখন ইহা মানিতেই হইবে যে ইহাদের আধারস্বরূপ একটা স্বতন্ত্র বৃত্তি রহিয়াছে। সেই বৃত্তির তিনি নাম দিয়াছেন চৈতন্য বা Reason.

বাহ্যবস্তু যে কি তাহা Kant জানেন না। সেটা একেবারে অজ্ঞেয়। অথচ সেটার সত্তা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের

জ্ঞানের মধ্যে আমরা যাহা পাই তাহার কিছুই বাহির হইতে পাওয়া নয়। তাহার সমস্তগুলিই, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চৈতন্য, ইহার কোনও না কোনও বৃত্তি হইতে পাওয়া গিয়াছে। অথচ ফিক্টে যেমন সেগুলিকে প্রমাতৃচৈতন্যের স্বাবরোধ হইতে স্বাভাবিক নিয়মে নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সে রকমের কোনও চেষ্টাও এখানে নাই। কাণ্ট শুধু আমাদের জ্ঞান বিশ্লেষ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি পাইয়াছেন। এবং তাহারই বলে তিনি বলিয়াছেন যে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে আমরা যাহা কিছু পাই সমস্তই জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি হইতে পাওয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত বিভিন্ন বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধিগুলি অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট বিশিষ্ট শক্তি দ্বারা একত্র গ্রথিত হইয়া আমিত্ববোধরূপে যুক্ত হইলেই বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানাকারে তাহাদের পরিস্ফুর্ত্তি হয়।

সত্যের সীমানা গুটাইয়া কাণ্ট্ তাহাকে একেবারে অন্তরের মধ্যে লইয়া আসিলেন। আমাদের অন্তরের মধ্যে নানা প্রত্যয়সন্তানরূপে যে জ্ঞানধারা চলিয়াছে, বাহিরেও বিষয়চৈতন্যের

মধ্যেও, নানা প্রকাশে, যে জড় জগতের মধ্যে তেম্‌নি ভাবেই, সত্যস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন তাহা কাণ্ট বুঝিতে পারেন নাই। এবং তাহারই ফলে বাহিরের জগৎ ও অন্তরের জগৎ এই উভয়কে মিলাইবার কোনও গ্রন্থি খুঁজিয়া পান নাই। শুধু তাই নয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রভৃতির মধ্যে যে স্বগত ভেদ ও বিরোধ রহিয়াছে, সেগুলিকে কাটাইবার ও তাহাদের মিলন করাইবার জন্য তাঁহাকে যে সমস্ত উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে সেগুলিও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। একদিকে যেমন বাহ্য-জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুইটিই একেবারে অসম্বদ্ধ ভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; অপর দিকে আন্তর বৃত্তি-গুলিও তেম্‌নি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। সত্যের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র কতকগুলা খণ্ড খণ্ড অবয়বকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাহারও সহিত কাহারও তেমন যোগ নাই।

তত্ত্বের দিকে তিনি এই যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রের দিকে, কি নীতির (Ethics) দিকেও সেই একই বিচ্ছেদ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। সমাজশক্তিকে স্বতন্ত্র-

ভাবে স্বীকার করিয়া ব্যক্তিশক্তির সহিত তাহার স্বাভাবিক মিলন না দেখাইয়া উভয়কে একেবারে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। একই সমাজশক্তি আপনাকে সফল করিবার জন্য, যে, ব্যক্তির বহুধা বিচিত্র রূপ দিয়া আপনাকেই প্রকাশ করিতেছে তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সমাজ এবং ব্যক্তি উভয়ই যে একই শক্তির আত্ম-প্রকাশ, এ তথ্যে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সেই জন্যই একদিকে যেমন বাহ্য জগতে জড়শক্তির যথার্থ প্রতিষ্ঠা দেখিতে পান নাই, অপর দিকে তেমন সমাজশক্তিকে তাহার যথার্থ আসন দিতে পারেন নাই।

সত্যকে তার নিজের স্বরূপের মধ্যে দেখা তাঁর ঘটে উঠ্‌লনা, তিনি বুঝ্‌লেন না যে সত্যই সমাজ দেবতার মধ্য দিয়ে স্পন্দিত হয়ে আমাদের প্রাণে প্রাণে সঞ্চরিত হচ্ছে। তাই তিনি বুঝ্‌লেন্ না যে, যে বাণীটা সত্যের বাণী বলে আমরা বুঝ্‌তে পারি, সেটা সমাজের মধ্য দিয়েই আমাদের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। তাই তিনি মনে করিলেন যে আমাদের মধ্যে আমরা সত্যের যে বাণীটা লাভ করি সেটা বুঝি সকল দেশে

এবং সমাজে একেবারে অভিন্ন। তিনি বুঝিলেন না যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকমের বাণী স্ফুরিত হয়ে উঠ্‌ছে। সত্যের বিকাশের দিক্‌টা তিনি দেখেন নাই, তাই তিনি তাকে এক স্থলেই বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সত্যকে তার অপরিস্ফুটতার মধ্যেই দেখিয়াছিলেন। কাযেই এই জগতের মধ্যেও সত্যকে দেখিতে পাইলেন না। সকল দৃশ্য, শ্রব্য হইতে তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেলেন। কোনও একটি সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে আসিয়া না দাঁড়াইয়া, এপাশ ওপাশ হইতে সত্যকে আলিঙ্গন করিলেন মাত্র। আমাদের কর্ত্তব্যগুলি যে সত্যের অস্ফুট নিয়ম (Abstract form) ছাড়াও, স্পষ্ট এবং স্ফুটভাবে প্রকাশিত হতে পারে, তাদের যে একটা concrete sphere বা প্রাকট্য আছে তাহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। আমার প্রাণের মধ্যে যে বাণী সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি, সমাজের দিকে একবার চাহিলেও যে তাহাই অনুষ্ঠিত ও পুরস্কৃত হইতেছে দেখিতে পাইব, তাহা তিনি বুঝেন নাই। কাযেই অখণ্ড সত্যের মহামহিমময় নিয়মকেই

পালন করিয়া যাইব, আর কোনও দিকে দেখিব না, এই যে তাঁহার categorical imperative তাহাও তাঁহার পরবর্ত্তিরা আসিয়া Abstract অর্থাৎ অস্ফুট বোধ, বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন এবং তিনি নিজেও তাঁহার মতের সকলদিকের সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই; চারিদিকেই গলদ রহিয়া গিয়াছে। সমাজ জীবনের মধ্যে যেটা কর্ত্তব্য বলে পরিস্পন্দিত হইতেছিল আমার জীবনের মধ্যে আসিয়া সেইটাই ধ্বনিত হইয়া আমার কর্ত্তব্য-বোধ বলিয়া পরিণত হইল, কাজেই আমি দেখি যে আমার মনের মধ্যে যেটা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে, সমাজেও তাহা পরিপালিত হইয়া চলিয়াছে এবং বাহিরে আইন, কানুন, পুলিশ পাহারার আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সকলের গতিকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। সত্যেরই অলঙ্ঘ্য নিয়ম যেমন ভিতরে আমার সকল কার্য্যকে নিয়মিত করিতেছে, তেমনি বাহিরে Law বা ধর্ম্মরূপে সকলকে স্ফুটভাবে কোনটা পথ, কোনটা নয়, তাহাই বলিয়া দিতেছে, যাহাতে কাহারও কোনও গোলমাল উপস্থিত হইতে না পারে।

অন্তরের ক্রীড়াটার অন্তরে প্রকাশ, বাহিরের বিকাশটার বাহিরের দিকে প্রকাশ। ন্যায্য করিলে পুরস্কার আছে, অসত্যের সাজা আছে। ব্যক্তি যখন নিজকে বড় করিয়া সত্যের সিংহাসনে বসাইতে চায়, এবং সেই সত্যের গতিকে বাধা দিতে চায় তখন সত্য তাহাতে বাধা দেয়। সমগ্র বিশ্বের সত্যের শক্তি তার বিরুদ্ধে রুখে আসে, তাহাতেই তার সাজা হয়, তাহাতেই তার কল্পিত সিংহাসন ধূলি অবসান হয়ে যায়, এবং দুঃখ মনোকষ্ট এবং অশান্তি লাভই তার চরম হয়ে থাকে। তবেই মোটামুটি দেখ্‌তে গেলে এই দাঁড়ায় যে সর্ব্বথা সমাজ জীবনের অনুবর্ত্তন করাই ধর্ম্ম এবং তদিতরই অধর্ম্ম।

এই কথাটা ঠিক বলিয়া ধরিয়া নিতে গেলেই একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসিয়া উদয় হয় যে, যখন সমাজ নিজেই উন্মার্গগামী হয় তখনকার কথা কি? সমাজ নিজেই যখন মহা সত্যের দিকে অগ্রসর না হয়ে তার থেকে ভ্রষ্ট হোতে চায় তখনও কি সমাজকে অনুবর্ত্তন করাই ধর্ম্ম? সমাজ ধর্ম্মই করুক আর অধর্ম্মই করুক তার জীবনই যখন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে

তখন সে আর সমাজকে উল্লঙ্ঘন কর্‌বে কি করে? সমাজের বাণীইত তার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে দিচ্ছে; তাকে ছাড়া তার চলেনা; তার বিবেকত সমাজেরই অনুরণন। তবে সেই সমাজ যখন অধর্ম্মের দিকে, অন্যায়ের পথে চলেছে, তখন সে কেমন করে অন্য পথে চল্‌তে পারে। বাস্তবিক্‌ই তা সর্ব্বতোভাবে পারে না। সেই জন্যইত সমাজের যখন কোনও দুরবস্থা আসে তখন সেই সমাজের নেতারা পর্য্যন্ত ঠিক থাক্‌তে পারে না—সমাজের দোষ তাদের উপর সংক্রামিত হয়ে পড়ে; চারিদিকের ধূলোয় তাঁরা পথ দেখতে পান না, অন্ধকারের ঘোরে ভীষ্মের মতন লোক, চোখের সম্মুখে প্রকাশ্য রাজসভার মধ্যে দ্রোপদীকে অতি নির্লজ্জভাবে, অতি নৃশংসভাবে অপমানিত হোতে দেখেও, কথা কহিলেন না। যিনি সত্যের জন্য আজীবন ব্রহ্মচারী, সমস্ত রাজ্য অপরকে ছেড়ে দিলেন, তিনি কিনা "অন্নস্য পুরুষো দাস" বলিয়া অসত্যের অধীনতায় জীবন বিক্রয় করিয়া দিলেন। যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের জন্য প্রাণসমা ধর্ম্মপত্নী দ্রোপদী, নিজের একান্ত আজ্ঞাবহ ভ্রাতৃবর্গ, সমস্ত রাজ্য, একেবারে

একটুও দ্বিধা না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনিই অনুরক্ত, বিশ্বাসী, গুরু, ব্রাহ্মণ, দ্রোণকে, তার পুত্র-বধের মিথ্যা সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দ্রোণের মৃত দেহটা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল তখন কথাটিও কহিলেন না। সমাজ তখন অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তার দোষগুলি সে সময়ের যারা সেরা ছিলেন, যারা নেতা ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কলঙ্ক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সমাজকে একেবারে উল্লঙ্ঘন করে যেতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের কোথায়?

তবে মহান্ সত্য যখন সমাজের মঙ্গলের জন্য তার মধ্যে নিজের স্বরূপ জাগিয়ে দিতে চান তখন সমাজের মধ্যে এমন লোকও জন্মে যাঁরা সমাজের মধ্যে তাঁদের আদর্শ না রেখে তাৎকালিক সমাজের অতীত, অব্যাহত সত্যের উপর নিজের আদর্শকে স্থাপিত করেন এবং তার থেকেই অনুপ্রাণনা গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁরা সমাজের দিকে চাননা, সমাজের গতির আদর্শকে ছাড়িয়ে তাঁরা যান; তখন সমাজের সঙ্গে তাঁদের সংজ্ঞর্ষ উপস্থিত হয়। সমাজ চায় সে যেভাবে ফুটেছিল, সেই ভাবেই

তাঁকে যাতে ফোটাতে পারে কিন্তু তিনি তা মানেন না। সমাজ তাঁকে মানাবার জন্য ব্যগ্র। তিনি সত্যের বলে বলীয়ান্। সমগ্র সত্য থেকে তাঁর বল আসে। তিনি পাহাড়ের মতন সমাজকে রুখে দাড়ান। সমাজের আঘাত, আক্রমণ, তিনি অম্লান বদনে সহ্য করেন।

সক্রেটিশকে এথেনিয়েরা বলিল তুমি আমাদের যুবকদের খারাপ করিতেছ, তুমি এ মত প্রচার করিতে পারিবে না, তিনি বলিলেন আমি ইহা করিবই করিব। ফলে তাহারা তাঁহার উপর কত অত্যাচার করিল তাঁকে বিষ দিল, কিন্তু সমাজ নিজেই আটকে গেল, তাঁর মতেই জয় জয়কার পড়ে গেল। এখনও সকলে বলে সক্রেটিশের মতন জ্ঞানী আর হয় নাই। কেন? তার মত কি জ্ঞানী আর হয়নি? তা নয়, তিনি যে সমাজের দৈন্যের সময় সমাজকে অনুবর্ত্তন না করে সত্যকে অনুবর্ত্তন করেছিলেন এবং তাই করে সমাজের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাহাতেই তাঁর মহত্ত্ব। সমাজের গ্লানি দূর করিবার জন্য দেবতার অংশস্বরূপে মহাপুরুষদের জন্ম হয়।

তাঁহারা সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়া সমাজকে উদ্ধারের পথে আকর্ষণ করিতে থাকেন।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

দেশভেদে ও সমাজভেদে এই অবতারের স্বরূপের নানা বৈষম্য দেখা যায়। যে সমস্ত দেশ বা সমাজ প্রধানতঃ রাষ্ট্রশক্তির দিক্ দিয়া সার্থকতা লাভ করিবে, সেখানে যে সমস্ত লোকাতিশায়ী পুরুষের জন্ম হয়, তাঁহারা প্রায়ই যুদ্ধবীর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের সহিত সঙ্ঘর্ষে চারিদিকের ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। ইহা-দিগকে World-Historical Individuals বলা যাইতে পারে। জীবনময় এঁদের সঙ্ঘর্ষ, এবং প্রয়োজন শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের তিরোধান। "If we go on, to cast a look at the fate of these World-Historical persons whose vocation it was to be the agents of the world-spirit, we shall find it, to have been no happy one. They attained no calm enjoyment; their whole life was labour

and trouble; their whole nature was nought else but their master-passion. When their object is attained they fall off like empty hulls from the kernel. They die early like Alexander; they are murdered like Cæsar; transported to St Helena like Napoleon." রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইঁহাদের জন্ম। কোনও পাপ বা অন্যায় করিয়াও যদি সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ইঁহারা তাহাতে কুণ্ঠিত হন না। ইঁহারা সেই এক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিয়াছেন। পথে যাহা কিছু পড়ে সমস্ত পদদলিত করিয়া ইঁহাদের রথ ছুটিতে থাকে। "He is devoted to the One Aim, regardless of all else. It is even possible that such men may treat other great and even sacred interests inconsiderately; conduct which is indeed obnoxious to moral reprehension. But so mighty a form, must trample down many an innocent flower, crush to pieces many an object

in its path. ইঁহাদিগের আদর্শেই Nietzche এর Superman এর আদর্শ গঠিত হইয়াছে।

এই লোকাতিশায়ী পুরুষদিগের তথ্য পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া আমরা সত্য ও বাধার মিলনের আর একটা নূতন স্তরে উপনীত হই। বিরাট মানবজাতি বা Humanity'র সত্তা দ্বারা অবান্তর জাতি, রাষ্ট্র বা সমাজগুলি অনুপ্রাণিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক সমাজশক্তি আবার ব্যক্তিশক্তিকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। কাযেই ব্যক্তি-শক্তির সমাজশক্তিকে ও সমাজশক্তির বিরাট মানব-শক্তি বা Humanityকে বাধা দিবার সাধ্য নাই এবং এই বাধা দিবার চেষ্টায়ই পাপের সৃষ্টি। একদিক্ দিয়া দেখিলে অনন্ত, অসীম, কেমন করিয়া সান্ত ও সসীমকে আয়ত্তীভূত করিয়া রাখিয়াছেন তাহারই নিদর্শন পাইয়া থাকি। অপরদিকে তেম্নি সসীম ও সান্তের দিক্ থেকেই একটা প্রবাহ অসীমকে আন্দোলিত করে ও তাহার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে, একথাও তেম্নি সত্য। একদিকে যেমন সমাজের প্রাণশক্তি হইতেই ব্যক্তির সৃষ্টি, অপরদিকে তেম্নি ব্যক্তিশক্তির প্রাণলাভেই সমা-

জের প্রতিষ্ঠা ও পোষণ। এক একজন লোকাতিশায়ী পুরুষের জীবনে এই সত্যটি এমন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে যে তখন আর ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার থাকে না। এক একটা সমাজ, এক একটা দীর্ঘযুগের ইতিহাস, একজন লোকের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়, ইহার ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। A nation maketh a man একথা যেমন সত্য "A great man makes a nation" একথাও তেমন সত্য। সমাজের বাধা ব্যক্তি। ব্যক্তির বাধা সমাজ। সমাজশক্তির আলোড়নে ব্যক্তির সৃষ্টি। আবার ব্যক্তির আলোড়নেই সমাজের পোষণ। দুইটি বিভিন্ন বিকাশের মধ্যদিয়া সেই বিরাটই আপনাকে সার্থক করিতেছেন। একের প্রতিঘাতে অন্যের পরিস্ফুরণ আবার একের শক্তির অন্যের মধ্যে স্বাভাবিক সংক্রমণে তাহার উপচয়। একটা প্রতিকূল ও আর একটা অনুকূল ধারা নিত্যই লাগিয়া রহিয়াছে।

ব্যক্তি সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেনা, কারণ সমাজের শক্তিই ব্যক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এই হিসাবে ব্যক্তি সমাজের অধীন। আবার

অপরদিকে সমাজের প্রাণপ্রবাহ যখন ক্ষীণ হইয়া আসে তখন সেই অভাবটুকু পূরণ করিবার জন্যই যেন লোকাতিশায়ী ব্যক্তির মধ্যে সেই শক্তির এক একটা অজস্র উৎস আবির্ভূত হইয়া সমাজের গতিকে পরিবর্ত্তিত করে। এম্নি করিয়া সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে নিরন্তর একটা যাতায়াত চলিয়াছে।

এক দিকে যেমন ব্যক্তি সমাজকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, অপরদিকে তেম্নি লোকাতিশায়ী ব্যক্তিরা (Historical individuals) এক একটা সমাজকে নূতন নূতন ভাবে বাঁধেন এবং নূতন নূতন রাষ্ট্রশক্তির সৃষ্টি করেন। এই দুইটি তথ্যকে একত্র করিলে দেখা যায়, যে ব্যক্তিও সমাজকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না এবং সমাজও ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। অথচ এ দুইটিকে দুইটি পৃথক বস্তুও বলা যাইতে পারে না, অথচ একেবারে অভিন্নও বলা যাইতে পারে না। একটি অপরটির আত্মস্বরূপ, একটি অপরটির বাধা। ইহাদের ভেদ এবং অভেদ, দ্বৈতত্ব এবং অদ্বৈতত্ব অচিন্ত্য। সাধারণ দৃষ্টিতে যতটুকু দেখা যায় তাহাতেও আমরা

দেখিতে পাই যে ব্যক্তিই সমাজকে গড়ে কি সমাজই ব্যক্তিকে গড়ে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কতকগুলি ব্যক্তি চিত্তের একত্র সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যের (psychological contiguity) ফলে যে একটি অখণ্ড একত্ববোধ হয়, তাহা ছাড়া সমাজত্ব বা জাতীয়ত্ব বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও জিনিষ আমরা দেখিতে পাই না, অথচ শুধু ব্যক্তিত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও ব্যক্তির সমস্তখানিকে আমরা পাই না। সমাজও মানি ব্যক্তিও মানি এবং তাহাদের এই অচিন্ত্য সম্বন্ধও মানি।

রাষ্ট্রের দিক্ দিয়া দেখিলে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধের কথা আমাদের মনে উদিত হয়, ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখিলেও আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এক একটা সমাজে এক এক দেশে বা কালে এক একটা স্তরের ধর্ম্মচৈতন্য উপস্থিত হয়, সেই সমাজের সমস্ত লোকেই তখন সেই অনুসারে আপনাদের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধকে এক এক বিশেষ বিশেষ ভাবে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। দেশের এই সাধারণ ধর্ম্মবোধ, কোনও সাধারণ ব্যক্তি অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু এক এক বিশেষ

বিশেষ সময়ে, এমন একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন যাহারা এই সমাজের ধর্ম্মবোধকে পরিস্ফুট ও বিকশিত করিয়া নূতন সত্যের নবোন্মেষের জ্যোতিতে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" এই মহামন্ত্রকে দেশের মধ্যে প্রাণময় করিয়া তোলেন। লোকাতিশায়ী ব্যক্তিদিগের (World Historical individuals) কায প্রধানতঃ এক একটা জাতি এবং যুগকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করে মাত্র, কিন্তু মহাপুরুষেরা ধর্ম্মচৈতন্যের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ও বিকাশকে আনয়ন করেন তাহা কোন একটা জাতি বা সময়কে উপলক্ষ্য করিয়া আরব্ধ হইয়া চিরদিনের জন্য সমস্ত মানবজাতির (Humanity) একটা নূতন পরিবর্ত্তন সম্পাদন করে। ইয়ুদি জাতির মধ্যে যতটুকু ধর্ম্মচৈতন্য জাগ্রত হইয়াছিল তাহাতে আমরা দেখি যে, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগত এই উভয়ের মধ্যেই যে, দেবতার যুগপৎ একই অধিষ্ঠান, অন্তর যাঁহার লীলাক্ষেত্র, বাহির ও যে তাঁহারই প্রচারভূমি, এ তত্ত্বের সেখানে সাক্ষাৎ নাই। তাই অন্তর ও বাহিরের মধ্যে সেখানে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই অদ্বৈত ঈশ্বর এই দ্বন্দ্ব কোনও দিন দূর করিবেন এই

অপেক্ষায় ও বিশ্বাসে তাঁহারা ধর্ম্ম ও ন্যায়ের জন্য সর্ব্বপ্রকার আত্মবলিদানে প্রস্তুত থাকিতেন, কিন্তু কেমন করিয়া দেবতা এই বিরোধ পরিহার করিবেন সে বিষয়ে তাঁহাদের কোনও বোধ ছিল না। ইয়ুদিরা অনেক দিনের চেষ্টার পর শুধু এইটুকুতে আসিয়াছিলেন যে ঈশ্বর শুধু তাহাদের জাতির জন্য নয়, তিনি সকলের জন্য। কিন্তু যিনি অন্তরে অন্তর্যামী তিনিই যে বাহিরে সমাজরূপে বিরাজ করিতেছেন ইহা তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। অন্তরে বাহিরে সত্যকে দেখিতে না পাওয়াতে পাপের স্থান কোথায়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না, এবং কেনই বা পাপের একটা আপাততঃ জয় দেখা যায়, তাহা তাঁহারা বুঝিতেন না শুধু অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন যে এমন একদিন আসিবে, যেদিন এ দ্বন্দ্বটুকু তিনি ঘুচাইয়া দিবেন। এইখানেই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম চৈতন্যের সঙ্গে ইয়ুদ ধর্ম্মচৈতন্যের প্রভেদ। অন্তরে বাহিরে যে একই দেবতা আপনাকে প্রকট করিয়া রাখিয়াছেন এই তথ্যটুকু খ্রীষ্টের হৃদয়ে, মনে ও জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই বোধের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বিরোধ তিরোহিত

হইয়া গিয়াছিল। "God is now conceived not as in all objective religions as a merely natural power, or as the unity of all natural powers nor again is He conceived as in subjective religion, as a spiritual being outside of human nature and dominating over it. He is conceived as manifesting himself alike in the whole process of nature and in the process of spirit as it rises above nature. In other words god is to Christianity as spirit as in subjective religions: but he does not exclude nature, nor is he external to it except in the sense that He is limited to it. He is immanent in nature as in objective religion, but he also transcends it, and makes it a means to the higher life of spirit." ইয়ুদ ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রভেদ দেখাইয়া কেয়ার্ড বলিয়াছেন :—" The assertion of God's universal relation to all men and

to all nations is true, as against the conception of Him as the head, whether by natural relationship or by arbitrary choice, of a particular race, but it is false if it be taken to involving that He is a God who does not manifest himself in the concrete social life of humanity or bind men together as the members of one society. ....The Jewish prophets said that the true sacrifice was not the outward offering of bullocks on the altar, but the willing and joyful submission of the soul, to the divine law of love. But this "not" of the prophets translated itself in practice into a " not merely," and it was therefore powerless to create a new order of social life, though it might do something to put a new spirit into the old order. The temple service might be despised, or regarded as insufficient, but it still

furnished the basis from which the Jew's aspirations after something higher had to start and to which they always returned. But Christianity absolutely rejected all mechanical observance of external rules detached from the spirit of life. Ritual ceased to be the service of god, so soon as that service was separated from the idea of obedience to a law externally given, and was conceived as the necessary outward expression of a divine principle which united men to each other as members of one divine-human society. In other words, the true service of God lay henceforth in these works of mercy and justice which were needful to make human society into a manifestation of divine love."

ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলেও দেখিতে পাই যে মীমাংসাযুগের বাহ্যিক অনুষ্ঠান, আচার, নিয়ম ও কর্ম্মকাণ্ডের একান্ত বাহ্যিকতা ও প্রাণশূন্যতার ফলে

ভারতবর্ষের ধর্ম্মচৈতন্যের উপনিষদযুগের মধ্যে যে নব জাগরণ দেখিতে পাই, তাহাতে বাহ্যবেদবিধান হইতে সত্যের প্রতিষ্ঠানকে একেবারে অন্তরের অন্তর্যামীতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিল। "য এষঃ অন্তর্যময়তি," "তৎসত্যং তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" "একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "একং রূপং বহুধা যঃকরোতি," তমাত্মস্থং যেনুহপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্" "নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-মেকো বহুনাং যোবিদধাতিকামান্" এই সমস্ত বাক্যাবলি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই যুগের বোধিতে বাহ্য কর্ম্ম-কোলাহল হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য তাঁহারা অন্তরের অন্তর্যামীতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জগৎটা তাহাদের নিকট হইতে যেন ক্রমশঃ সরিয়া পড়িতে লাগিল, জগৎকে জগতের মানুষকে, জগতের সমাজকে তাঁহারা তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই বোধকে পরিস্ফুট করিবার জন্য বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মীমাংসকদিগের বাহ্যিক কর্ম্মনিয়মে সত্যের প্রতিষ্ঠা, ও উপনিষদ্দিগের অন্তর্যামীতে সত্যের প্রতিষ্ঠা, এই উভয়দিকে যতটুকু সত্য ছিল তাহা একত্র হইয়া

বুদ্ধদেবের মনে উদিত হইয়াছিল। একটি অখণ্ড কর্ম্মনিয়মের মধ্যে তিনি ভিতর বাহিরকে সম্মিলিত করিলেন। কি চৈত্তিক, কি ভৌতিক, সমস্ত বস্তু-জাতই এক অখণ্ড নিয়মে উৎপন্ন হইতেছে, ভিতর, বাহিরে কোনও বিরোধ নাই, কোনও দ্বন্দ্ব নাই। আণবিক সমষ্টিতে যেমন বাহ্যজগৎ, রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, সংস্কার এই পঞ্চস্কন্ধের সংঘাতেও তেমনি অন্তর্জগৎ। ভিতর বাহিরের চঞ্চল প্রবাহের মধ্যে মানুষের বুদ্বুদ উত্থিত ও লীন হইতেছে! উত্থান ও লয় ইহাই সংসারের নিয়ম। স্থির হইয়া কিছুই নাই। এই কর্ম্মের প্রবাহ, ভিতর বাহির সর্ব্বত্র আপনাকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, এই বিরাট অভিযানই একমাত্র সত্য। এই বিরাট অভিযানের মধ্যে ভিতরে, বাহিরে, মানুষে মানুষে, জীবে জীবে, জীবে জড়ে সর্ব্বত্র যে একটি পরম ঐক্য নিহিত রহিয়াছে তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মের নব জাগরণ। এই জাগরণের ফলে, মানুষে মানুষে প্রীতি, সর্ব্বভূতে অহিংসা, একটা বিশ্বজনীন মৈত্রী, কঠোর উপনিষদ্‌ব্রতের স্থান অধিকার করিল। ধর্ম্মচৈতন্যের এই নবোন্মেষে সমাজে, রাষ্ট্রে, শিল্প,

শিক্ষায়, লোকহিতকর কার্য্যে, ধর্ম্মে, দর্শনে, সমস্ত দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজের মধ্যে যে কি পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই তাহা অবগত আছেন।

কিন্তু ধর্ম্মের যে একটা প্রধান উপকরণ "ভক্তি" সে দিক্টা এই বৌদ্ধধর্ম্মেও স্থান পায় নাই। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে সেই একের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যেমন তত্ত্বদর্শনের কায, ধর্ম্মের কায তেমনি এই তত্ত্বকে ভক্তি দ্বারা হৃদয়ে সার্থক করিয়া তোলা। ভিতর ও বাহিরকে নিয়ম দিয়াই এক করি, কি কর্ম্মপ্রবাহ দিয়া এক করি, তত্ত্ববিদ্যা তাহাতে ব্যাকুল হইবে না; কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান কথাই হইল এই যে আমরা ভক্তি ও পূজার উপচারে আমাদের অন্তরকে সেই বিরাটের উদ্দেশে নিবেদন করিব। আমাদের সার্ব্বজনীন হৃদয়ের এই পূজা ও ভক্তিবৃত্তির মধ্যে আমরা সত্যের যে মূর্ত্ত বিগ্রহ পাই, শুধু তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সে ক্ষুধার নিবৃত্তি কেমন করিয়া হইবে। এই মূর্ত্ত পূজাই সকল ধর্ম্মের বিশেষত্ব। জ্ঞাননেত্রে তাঁহার সত্যরূপ নিরীক্ষণ করিব, হৃদয়ের রসের দ্বারা তাঁহার নিকট আপনাকে

নিবেদন করিয়া তাঁহার সহিত চিরযুক্ত হইয়া রহিব এবং কর্ম্মের দ্বারা রসে ও জ্ঞানে যাঁহাকে পাইয়াছি তাঁহার সেবা করিব; ইহাই ধর্ম্মের আদর্শ। ধর্ম্মে যে বস্তুটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তত্ত্ববিদ্যায় তাহারই একদেশ মাত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে এই যে অভাবটুকু রহিয়া গিয়াছিল, তাহারই পরিপূরণের জন্য একদিকে পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল ও অপর দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকার আরম্ভ হইল। অবিরল সন্তানে আবির্ভূত হইয়া যে সমস্ত বৈষ্ণব মহাপুরুষগণ ভারতীয় সমাজের মধ্যে ধর্ম্মচৈতন্যে নবোন্মেষ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বিষয় পর্য্যালোচনা না করিয়াও কেবল মাত্র সকলের শেষে যিনি আসিয়াছেন সেই শ্রীচৈতন্যের দিকে লক্ষ্য করিলেও সমস্ত বৈষ্ণব সাধনার যথার্থ সারটুকু আমরা বুঝিতে পারি।

যে সময়ে তিনি নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন, সে সময় শুষ্ক তর্কশাস্ত্র আসিয়া গভীর দার্শনিক তত্ত্ব-বিদ্যার স্থান অধিকার করিয়াছিল, অর্ব্বাচীন এবং সঙ্কীর্ণ স্মৃতির বাঁধন আসিয়া সমাজকে নাগপাশে বাঁধিয়া তুলিতেছিল, তান্ত্রিকতার আবর্জ্জনাগুলি

দেশময় ছাইয়া পড়িতেছিল। উদারহৃদয় ও সত্য-নিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের এই দারুণ দুরবস্থায় বিপর্য্যস্ত ও হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছিলেন।

প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার।
কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয় ভোগ
ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ;
লোকগতি দেখি আচার্য্যের করুণ হৃদয়
বিচার করেন লোকের কিসে হিত হয়।

সমাজের তত্ত্বচৈতন্য ও ধর্ম্মচৈতন্যের এই দারুণ দুর্ব্বিপাকের সময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। যেমন খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ও তাঁহার চরিত্রকে পৃথক করা যায় না, মহাপ্রভুর ধর্ম্মও তেমনি তাঁহার চরিত্র হইতে কোনও ক্রমে পৃথক করা যায় না। তাঁহার সমস্ত জীবনময় যেন একটি নবচৈতন্যের জাগরণ। সমস্ত দিক্ থেকে তাঁহার জীবনের যে চিত্রটি আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট এবং সুসমঞ্জসভাবে একটি পূর্ণজীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমাদের বর্ত্তমান কালে যতগুলি ধর্ম্মসংস্কারকের কথা মনে পড়ে তাহাদের সকলের কার্য্যই তাঁহার

মধ্যে সংহৃত ও সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। কি রামমোহন, কি দেবেন্দ্রনাথ, কি পরমহংসদেব, কি কেশব, কি বিবেকানন্দ, কি বিজয়কৃষ্ণ, সকলেই যেন তাঁর এক একটি গুণাবতার। যাবতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া কি সমাজের দিকে, কি ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধের দিকে, কি জীবে জীবে সম্বন্ধের দিকে, কি তত্ত্বের দিকে, যতদিক্ দিয়া এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ধর্ম্মচৈতন্যের আবির্ভাব আমরা উপলাভ করিতে যাই, দেখিতে পাই শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণীর মধ্যে সে সমস্তগুলিরই বিচিত্র সমাবেশ রহিয়াছে।

ধর্ম্মের পথে ভক্ত আপনাকে ভগবানের নিকট নিবেদন করে; সসীম অসীমের সংস্পর্শে নবজীবন লাভ করে। শুধু জ্ঞানের দিক্ দিয়া যখন মানুষ দেবতার সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা করে, তখনই তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা বলি, কিন্তু শুধু জ্ঞান না হইয়া যখন রসের পথে, ভাবের পথে, এই মিলন সাধিত হয় তখনই আবার তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায়। জ্ঞানের পথের মিলনেও যেমন বিবিধ প্রস্থান এবং বিবিধ স্তর রহিয়াছে, ভাব ও রসের পথের

মিলনেরও তেমনি বিবিধ স্তর রহিয়াছে। ভয়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, দাস্য, প্রভৃতি নানাভাবেই, নানা ধর্ম্মে, এই মিলনের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু ভক্ত ও ভগবান যে একই সত্তার দুইটি রূপ, একটি সত্য, অপরটি বাধা; একটি কৃষ্ণ, অপরটি রাধা, এবং ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই যে পরস্পরকে আস্বাদ করিবার জন্য ব্যগ্র, ভগবানের আত্মাস্বাদের প্রবৃত্তিতে, স্বগত-প্রীতির বিকারেই যে ভক্তের জন্ম, এ কথা এ পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের মত কেহই বলিতে পারেন নাই। একই তত্ত্ব যেমন সত্য ও বাধার বিভিন্ন মূর্ত্তিতে জগদ্ব্যাপারকে মূর্ত্ত ও সার্থক করিয়া তুলিতেছে, এই দুইয়ের বিরোধে ও সংযোগে, যেমন সমস্ত সম্বন্ধ সত্তাময় হইয়াছে, তেমনি একই প্রীতি, একই আনন্দ আপনাকে মূর্ত্তিমান করিবার জন্য ভক্ত ও ভগবানরূপে ন্যস্ত হইয়া তাহাদের যুগল সম্বন্ধের মধ্য দিয়া সার্থক হইয়া চলিয়াছে। ভগবানের সহিত মানুষের যে এই স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ মাধুর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই রসে দ্রব হইয়া যদি মানুষ তাঁহার সহিত একত্র হইতে চেষ্টা করে তবে সেই চেষ্টার ফলেই, জীব ও জগতের সহিত তাহার যথার্থ

সম্বন্ধটি আপনিই তাহার প্রাণের মধ্যে যুগপৎ আবিষ্কৃত ও আবির্ভূত হয় এবং ধর্ম্মের সমস্ত বাহ্যাড়ম্বরগুলি মিথ্যা হইয়া অপসৃত হইয়া যায়। দেবতা শ্রীচৈতন্যের মধ্য দিয়া এই মাধুর্য্যরস আস্বাদ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে তাৎকালিক সমাজের সমস্ত হীনতা ও দারিদ্র্য বহুদূরে অতিক্রম করিয়া তিনি যে আদর্শে বিকশিত হইয়াছিলেন, সেখানে সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দুর্ব্বলতা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। দেবতা যে ভক্ত হইয়া আপনারই রস আস্বাদ করিয়া থাকেন, প্রেমজগতের এই নূতন তথ্যের আবিষ্কারের জন্যই শ্রীচৈতন্যের অবতার।

" শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ "

বিরাট যেমন ধাপে ধাপে নেমে এসে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষোদীয়ানে পৌঁছিয়াছেন, ক্ষুদ্রগুলিও তেমনি গিয়া সেই বিরাটে নানা পথে পৌঁছিয়াছে, উভয় দিক্‌ দিয়ে বুঝিতে যাওয়ার চেষ্টাতেই বাস্তবিক বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়।

তর্কশাস্ত্রের পথে আমরা দেখি যে তাঁর কোনও একটা প্রকাশ যদি আমরা ধরিতে পারি, তাহলে সেই প্রকাশ থেকে ধরে ধরে সম্বন্ধ যোজনা করে ক্রমশঃ সেই প্রকাশ কেমন করে ছোট হয়ে অত্যন্ত খণ্ডের মধ্যে এসে পড়েন তা আমরা ঠিক্ করিতে পারি। ডিম্ব প্রসবের সহিত গিলিয়া খাওয়ার এবং গিলিয়া খাওয়ার সহিত গালাসীর দাঁতের এবং গালাসীর দাঁতের সহিত কুমীরের তুল্য সম্বন্ধ আছে জানিয়া সম্বন্ধ যোজনা করিয়া ডিম্ব প্রসব ব্যাপারের সহিত কুমীরের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি। এম্নি করে কোনও একটি বিরাট প্রকাশের সন্ধান পেলে আমরা ক্রমশঃ তিনি যে কোন্ কোন্ যায়গায় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তা বের কর্‌বার জন্য চেষ্টা করি, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপকগুলির সন্ধান পেয়ে সেগুলিকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ছোট ছোট খণ্ডের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ব্যাপ্যের মধ্যে লাভ করিতে চেষ্টা করি, এবং বুঝিতে চেষ্টা করি যে সেই বিরাট প্রকাশ কোন্ পথ দিয়ে এসে ক্ষুদ্রের মধ্যে নিজকে পরিব্যাপ্ত ও পরিস্ফুট করেছেন। এই যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্য প্রকাশগুলি, ইহাদের

প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের সম্বন্ধ আছে, বাঁধুনি আছে; কারণ ইহাদের বড় বড় অন্যান্য ব্যাপকের তুলনায় এরা আবার ক্ষুদ্র এবং ইহাদের মধ্য দিয়ে সেই বৃহত্তর ব্যাপকগুলি সিদ্ধ ও পরিস্ফুট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান এত অল্প যে আমাদের এমন সাধ্য হয়না যে আমরা একটি ব্যাপ্য থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে ক্রমশঃ বৃহত্তর ব্যাপক, বৃহত্তম ব্যাপক এই ক্রমে একেবারে গিয়ে সেই বিরাটে পৌছিতে পারি। বিরাটই এই সমস্ত হয়েছেন এটা আমরা কোনও রকমে বুঝ্‌তে পারিলেও তিনি যে কোন্ পথে এই সব হলেন তা আমরা বল্‌তে পারিনা, তাঁর গতি আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এই যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্য প্রকাশগুলি, এদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে তা আমরা বুঝ্‌তে পার্‌লেও সে সম্বন্ধটা যে কি তা আমরা অনেক সময়ই বুঝিতে পারিনা। ছোট ছোট ব্যাপ্যগুলি হয়ত, অতি কষ্টে আমরা ধরিতে পারি কিন্তু তার পর সেই সব ব্যাপ্যগুলি আবার কেমন করিয়া পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, এবং সেই সম্বন্ধের দ্বার দিয়া আর কোন ও বৃহত্তর ব্যাপকের

সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিনা। আমরা ক্ষুদ্র, খণ্ড, আমাদের জ্ঞানও ক্ষুদ্র, এবং সসীম, তাই আমাদের বুদ্ধিটা ক্ষুদ্রের গণ্ডীর মধ্যেই বাঁধা পড়ে থাকে। ক্ষুদ্রকে ছাড়িয়ে যখন আমরা কোনও বৃহত্তর ব্যাপককে পেতে চাই তখনই সেটা আমাদের কল্পনা দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়। আমাদিগের পাঁচটি ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচটি দিয়াই বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের সম্বন্ধ ঘটিতে পারে। এই পাঁচটা দিয়ে আমরা যে সমস্ত সন্ধান পাই সেগুলি সমস্তই ক্ষুদ্র। এই সব ক্ষুদ্রের পিছনে যে ব্যাপক পড়ে রয়েছে, আমাদের চক্ষু, আমাদিগকে তার কোনও সন্ধান দিতে পারে না। তাই আমরা কতগুলি ক্ষুদ্রকে এক সঙ্গে সাজিয়ে দেখি যে তাদের মধ্যে কোন্ সত্যটি গোপনে লুকিয়ে রয়েছে: যখন অনেকগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা নিশ্চিন্ত হই যে তাদের মধ্যে এই সত্যটি নিভৃতে লুকিয়ে রয়েছে, এবং সকলকে বেপে রয়েছে, তখন সেইটাকেই আমরা ব্যাপক বলে ধরে নিই। এবং সেইখান থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ নূতন নূতন স্থানে যোজনা করে

ক্ষুদ্রে এসে পৌছিয়ে দেখি, মেলে কিনা। এই জ্ঞান দ্বারাই আমরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমাদের জ্ঞানের বিকাশ করি। একদিকে বিরাট আপনাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ফুটাইতে ফুটাইতে, প্রসারিত করিতে করিতে, এই সমস্ত ক্ষুদ্রে পরিণত হয়েছেন; অপরদিকে এই ক্ষুদ্র থেকে আপনাকে প্রসারিত করিতে করিতে সেই আপন বিরাটে গিয়ে পৌছবেন্ এবং এই হলেই তাঁর আপনার মধ্যে আপনার পূর্ণতালাভ জয়যুক্ত হয়ে উঠবে। শুধু নামের মধ্য দিয়া এই তথ্যটিকে দেখাই তর্কশাস্ত্র বা Log কায। বৃহৎ হইতে যখন ক্ষুদ্রে যাই তখন বলি deduction এবং ক্ষুদ্র হইতে যখন বৃহতে যাই তখন বলি induction। বস্তুতঃ ইহা একই ব্যাপারের দুইটি দিক্ মাত্র। এ দুইটিকে পৃথক করিবার কোনও উপায় নাই। বিরাট যেমন আপনাকে একদিকে প্রসারিত করিতে করিতে ক্ষুদ্রে আসিয়া পৌছেন, ক্ষুদ্র হইতে তিনি আপনাকে অপরদিকে তেমনি প্রসারিত করিতে করিতে বিরাটে গিয়ে পৌছেন।

যার প্রসারের পথ বাঁধা আছে তার সঙ্কোচের

পথও বাঁধা আছে; কাযেই সেস্থলে প্রসার বলিলে যাহা বুঝায়, সঙ্কোচ বলিলে ঠিক্ তার বিপরীত গতিটাই বুঝায়; দুইটা দুদিকে। কোনটা দিয়েই কোনটার আনাগোণার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর ত কোন বাঁধা পথ নেই যে এইটেই তার সঙ্কোচ এবং এইটেই তার প্রসার; যেটা বাঁধা জিনিষ তারই এক একটা বাঁধা পথ থাকে, একটা অগ্র পশ্চাৎ থাকে, কিন্তু যিনি অখণ্ড যাঁর পথে কোনও বাধা নেই, যাকে রুখ্‌বার কেউ নেই, যাঁর সম্বন্ধে একথা বলা চলেনা যে ইনি এইটুকু, ইনি এখানেই আছেন; তার পথ কি করে নিয়ম করে দেওয়া যায়; কি করে একথা বলা যায় যে ইনি এদিক্ থেকে এদিকে গিয়েছেন কাজেই এই হচ্ছে এর সম্মুখ আর এইটে হচ্ছে পিছন। যখন তাঁর কোনও একটা দিক্ ধরে নিয়ে চিন্তা করি তখনই আমরা তাঁর একটা সম্মুখ এবং একটা পিছন কল্পনা করি। যখন বিরাটের বিষয় ভাবিতে চেষ্টা করি তখন মনে হয় যে বিরাটের খণ্ড হওয়া বাকী ছিল, কাযেই বিরাটের কাছে সেটা অপূর্ণতা

বিরাটকে যতক্ষণ বিরাট ভাবেই কল্পনা করা যায় ততক্ষণ যেন তাঁকে সেই খানেই আবদ্ধ বলে মনে হয়। বিরাট যদি খণ্ড না হতে পারেন তবে তাঁর সেটা একটা দৈন্য, একটা বাধা, একটা অভাব। তাই বিরাটের দিক্ থেকে দেখতে গেলে বিরাট তাঁর বাধাকে অতিক্রম করে তাঁকে প্রসারিত কচ্ছেন, এটা ভাবতে গেলেই মনে হয় যে তিনি খণ্ডের দিকে চলে আসছেন। তাঁর এই খণ্ডের দিকে আসাটাকেই আমরা যেন তাঁর প্রসার বলে মনে করে নিই, তিনি নিজের বাধাকে ক্রমশঃ নিজের মধ্যেই স্বীকার করে নিয়ে সমস্ত বাধাগুলি একে একে উল্লঙ্ঘন করে একেবারে খণ্ডেতে এসে পৌছান। তাঁর বাধা গুলি ক্রমশঃ তাঁর মধ্য দিয়েই গৃহীত হয়ে তাঁর সত্যের আকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই স্তরে আসিলে আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহার বিপুল প্রস্থানকে আমরা যে প্রকাশ ও বাধার দ্বন্দ্ব ও মিলনের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহাও ঠিক নয়; কারণ প্রকাশ ও বাধা ইহারা উভয়েইত আপেক্ষিক, কেহইত তাত্ত্বিক নয়। তাত্ত্বিক শুধু তিনি নিজেই; এ দুটিই

আমাদের কল্পনা মাত্র। তাঁর যাত্রা সেই পূর্ণ হইতে পূর্ণে। পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ। পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে ॥ পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। তিনি পূর্ণ, তাঁর গতিও পূর্ণ। তাঁর কোনও অগ্র-পশ্চাৎ নাই। প্রকাশ ও বাধা বলিয়াও তাঁহার কোনও তাত্ত্বিক পার্থক্য বা ভাগ নাই। আমাদের বোধের সৌকর্য্যের জন্য আমরা তাঁহার গতিকে ঐভাবে দেখিয়া থাকি।

তিনিই এই সমস্ত হয়েছেন; সমস্ত খণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনিই পরিণত হয়েছেন। আবার যখন খণ্ডে এসে পৌছি তখন দেখি যে খণ্ড অখণ্ডের মধ্যেই পড়ে আছে, এর বৃদ্ধি হতে গেলেত আর খণ্ডের দিক্ দিয়ে হতে পারেনা; খণ্ড যে অনন্ত নয়, সেইটেই হচ্চে তার বাধা, তার অভাব। খণ্ড যত অনন্তের দিকে উঠ্‌তে পারবে, ততই তার বাধা ঘুচ্‌বে। অতএব খণ্ডের উন্নতি দেখ্‌তে হলে, তার প্রসার দেখ্‌তে গেলে, অনন্তের দিকেই দেখ্‌তে হবে। সে যে খণ্ড, সেই খানেই তার একটা বাধা, এবং অভাব। সে যে অনন্ত নয়, তাই তার বৃত্তি সেই দিকেই সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে, তাই তার প্রসার

দেখতে গেলে সেই অনন্তের দিকেই খুজ্‌তে হবে। তাই আমরা দেখ্‌তে পাই যে, খণ্ড তার বাধাগুলিকে একে একে নিজের মধ্যে গুছিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে, নিজের প্রসারের পথে, বৃদ্ধির পথে, অনন্তের পথে, ছুটতে ছুটতে বিরাটের মধ্যে প্রবেশ করে।

এক দিক্‌ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে প্রকাশকেই বাধা বলে মনে হয়, পূর্ণতাকেই অপূর্ণ বলে মনে হয়, এবং আর এক দিক্‌ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে অপূর্ণতাকেই পূর্ণ বলে মনে হয়। এটা ঠিক করে বলবার উপায় নাই, যে এইটেই সত্য আর এইটেই বাধা, এইটাই পূর্ণ আর এইটা অপূর্ণ।

সত্য যে তাঁর আপন আত্মলাভের চেষ্টায় অসীম হইতে সসীমে, ও সসীম হইতে অসীমে, বিরাট হইতে ক্ষুদ্রে ও ক্ষুদ্র হইতে বিরাটে, নিত্য গমনাগমন করিতেছেন এইটুকুই তাঁর নিগূঢ় তত্ত্ব। বিরাট্‌ হইতে ক্ষুদ্রে, ও ক্ষুদ্র হইতে বিরাটে, অনন্তের যে এই বিবিধ বিচিত্র ক্রমবিস্তার চলিয়াছে, সমস্ত তত্ত্বান্বেষীরা চিরদিন ধরিয়া এই লীলাতত্ত্বই অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন। নানাশক্তি কেমন করিয়া এক শক্তিতে আপনাকে পর্য্যবসিত করে ও একশক্তিই

বা কেমন করিয়া নানাশক্তিতে আপনাকে প্রকট করিতেছে, জড়বৈজ্ঞানিকেরা তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন। একই প্রাণ নানা প্রাণীর মধ্যে কেমন করিয়া বিচিত্র প্রসারে অপরিসংখ্যেয়ভেদে আপনাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন, প্রাণতত্ত্বের তাহাই আলোচনার বিষয়। রূপ হইতে রূপান্তরে যে উৎপত্তি লয়ের খেলা চলিতেছে, তাহা সেই অরূপেরই রূপলীলা। এই অপূর্ব পরিণামের ইতিহাসেই সমস্ত রূপজগৎ পরিপূর্ণ। অরূপ রূপে ফুটিয়া উঠে, এবং রূপ অরূপে লয় পায়, ইহাই যেমন বাহ্যজগতের একদিকের সফলতা, অপর দিকে তেমনি সমস্ত রূপান্তর লইয়া বিরাট্ ভৌতিকজগৎখানার যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহের জন্য একটি চিত্তজগতের প্রয়োজন। সেই জন্যই আমরা দেখি যে রূপ হইতে প্রাণের বিকাশ ও প্রাণ হইতে চিত্তের বিকাশ। প্রাণের নিত্য ক্রিয়ার মধ্যে রূপজগৎ ও চিত্তজগৎ সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে। তিনিই যেমন "রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ", তেমনি "স উ দেবঃ প্রাণস্য প্রাণঃ" আবার "মনসো মনো"। প্রাণ-শক্তির লীলাভূমির মধ্যে সেই সত্যস্বরূপ আপন

ভৌতিক ও চৈত্তিকস্বরূপের মিলনাস্বাদ সম্ভোগ করিতেছেন। যেমন ভৌতিক জগতের মধ্যে অরূপ নানারূপের লীলায় আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন, তেমনি চৈত্তিকজগতের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাই যে এখানেও সেই অন্ত ও অনন্তের পরস্পর আত্মপরিণতির লীলা সেই একই ভাবে চলিয়াছে। সেই চৈতন্যস্বরূপ বহু হইবার ইচ্ছায়, একদিকে পঞ্চেন্দ্রিয়রূপে বিষয়চৈতন্যের রূপ-সম্ভারকে সংগ্রহ করিতেছেন ও প্রাণশক্তির মধ্যে নানাবৃত্তিময় করিয়া সেগুলিকে আপনার মধ্যে গ্রাস করিতেছেন ও অপরদিকে সেইগুলির অসংখ্যেয় রূপের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এক্ দিকে তিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, অপরদিকে তেমনি, "ন তত্রচক্ষুর্গচ্ছতি নো বাগ্ গচ্ছাত নো মনো" সেখানে চক্ষুও যায় না, বাক্যও যায় না, মনও যায় না।

সেই অরূপ চিৎস্বরূপ, একদিকে যেমন রূপময় বিষয়চৈতন্য, ও আত্মস্বরূপ প্রমাতৃচৈতন্য হইয়া রহিয়াছেন, অপর দিকে আবার তিনিই তেমনি এই উভয়ের মিলনস্বরূপ নামময় প্রমাচৈতন্য হইয়া

রহিয়াছেন। এই মিলনের তত্ত্ব অন্বেষণ করিবার জন্যই মনোবিজ্ঞান বা Psychology ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। আবার এই প্রমাচৈতন্যের মধ্যে যখন তিনি নামময় (conceptual) হইয়া উঠিলেন, তখন দেখি যে নামধারায় তিনি অন্ত হইতে অনন্ত পর্য্যন্ত, ব্যাপকতম হইতে ব্যাপ্যতম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এই বিচিত্রতার অনুসন্ধানেই যে তর্কশাস্ত্রের সফলতা, গ্রন্থারম্ভেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাইয়াছি। আবার এই সমস্ত বৃত্তি, নাম, প্রভৃতি চৈত্তিক উপাদানসম্ভারে যখন তিনি মনঃশরীরে স্থূলশরীরে, শরীরী হইয়া বাহ্যজগতের সম্মুখে অসংখ্যেয় শরীরীর মধ্যে দাঁড়ান ও তাহাদের সহিত ব্যবহারে আপনার মিলনবৃত্তিকে ও প্রাণ-বৃত্তিকে সার্থক করিতে চান, তখন সমস্ত ক্ষুদ্রতার সীমাকে অতিক্রম করিয়া একটি অসীম কর্ত্তব্যের বাণী আসিয়া সমস্ত খণ্ড, ক্ষুদ্র ও সসীমকে প্রাণ-সঞ্চারে ব্যক্ত করিয়া তোলে। এই বাণীর মধ্যে মানুষ দেখিতে পায় যে, সে তার সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব, সমস্ত খণ্ডত্ব, ব্যক্তিত্ব, পরিহার করিয়া আপন অনন্ত অসীম সত্তাকে অনুভব করে। নিজের

ভাল বলিয়া পৃথক্ করিয়া সে কিছু লইতে পারেনা, সে চায় শুধু "ভালকে।" সকলের "ভালর" মধ্যে যে "ভাল" সফল হইয়া রহিয়াছে, সে চায় শুধু সেই "ভালকে"। তার কাজের মধ্যে সে এমন একটা প্রাণশক্তির ব্যাপক, অখণ্ড, প্রেরণা অনুভব করে, যে তার ক্ষুদ্রতার ভারে সে কোনও রকমেই সেটিকে মুচ্‌ড়াইতে পারেনা। তার প্রবৃত্তির মধ্যে যে নানাত্ব ছিল, এই ব্যাপক প্রেরণার তাড়নায় সেগুলি সেই একে পরিণত হয়। প্রবৃত্তি বা ব্যক্তিত্বের নানাত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের সহিত এই ব্যাপক বিবেকের অন্তঃপ্রেরণার মিলনের যথার্থ তথ্যটি অনুসন্ধান করিবার জন্যই "Ethics" বা নীতি-শাস্ত্রের সৃষ্টি।

কর্ম্মের মধ্য দিয়া ব্যক্তিকে ভূমার পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া যেমন নীতির ক্ষেত্র, তেম্‌নি জ্ঞানের মধ্য দিয়া সত্যের যথার্থ স্বরূপকে আয়ত্ত করার চেষ্টায় তত্ত্ববিদ্যা বা Philosophyর সৃষ্টি। জগদ্ব্যাপারের অন্তর্নিহিত বস্তুতত্ত্বটির যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, আর সমস্ত ক্ষুদ্র ও খণ্ড প্রত্যয় সমূহকে (experience) তাহার মধ্যে অন্তর্ভূত ও তাহার

অঙ্গীভূত করিয়া দেখাই তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সৃষ্টির যে বিভাগের দিকেই নিরীক্ষণ করি না কেন, দেখিতে পাই যে নানা বিচিত্র উপায়ে স্তরে স্তরে সেই ভূমা আসিয়া, খণ্ডের মধ্যে আপনাকে পরিণত করিয়াছেন। কি বাহ্যজগতের জড় ও প্রাণের লীলা, কি অন্তর্জগতের চিৎ ও প্রাণের লীলা কি বাহ্যান্তর্জগতের সমাজ ও ব্যক্তির লীলা, সৃষ্টির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সর্ব্বত্রই অখণ্ডের খণ্ড হইবার ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। অপর দিকে আমাদের ব্যাপারের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে দেখিতে পাই যে, আমাদের সমস্ত কাযের মধ্যে জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে, খণ্ড হইতে অখণ্ডে ফিরিয়া যাওয়ার একটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। অখণ্ড যেমন আপনার বিরাট্ ও অখণ্ড মূর্ত্তিতে তৃপ্ত না হইয়া আপনার খণ্ডমূর্ত্তিকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই অলৌকিক উপায়ে আপনাকে খণ্ডমূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত করিতেছেন, খণ্ডও তেমনি তাহার সর্ব্ববিধ কার্য্যের দ্বারা আপনাকে অখণ্ডের দিকে উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছে। খণ্ড অখণ্ডের মূর্ত্তিতে ও অখণ্ড খণ্ডের

মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা পরস্পরকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া, এই যুগল বিগ্রহে যে সেই একই মূর্ত্তির প্রকাশ তাহা প্রমাণ করিতেছে।

সত্যের এই মূর্ত্তিকে যথার্থভাবে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তত্ত্বানুশীলিরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। নানা দেশে নানাভাবে এই তথ্য আবির্ভূত হইয়াছে। এক একজন এক এক সময় এক এক দিকে ঝোঁক দিয়া সত্যের স্বরূপকে এক এক স্থানে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সত্যের অপরদিকটা, তাঁহাদের চোখেই পড়ে নাই। কেহ কেহ কোন্‌টি যথার্থ মূর্ত্তি তাহা বুঝিতে না পারিয়া সংশয়ী (sceptics) হইয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ বা খণ্ড এবং অখণ্ডের মধ্যে যে আত্মপরিণামের ব্যাপারটি রহিয়াছে, সেইটুকুকেই প্রধান মনে করিয়া চলত্বকেই প্রধান করিয়াছেন।

সত্যের চিন্ময়রূপের সহিতই আমরা বিশেষভাবে পরিচিত, তাই অনেকে সত্যকে চিৎস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া জড়জগতের খণ্ড ও ক্ষুদ্রের সহিত তাহার মিলনকে অযথার্থ ও মিথ্যা বলিয়াছেন। এই মিথ্যাই কাহারও চক্ষুতে ভ্রম বলিয়া মনে হইয়াছে,

কাহারও চক্ষুতে মায়া বলিয়া বোধ হইয়াছে। কাহারও বা উপরজ্য উপরঞ্জকতা ভাবে বোধ হইয়াছে। কেহবা আবার এই অনন্ত চিজ্জগৎ ও খণ্ড সসীম বাহ্য-জগতের মিলনের তথ্যটিই ধরিতে না পারিয়া, বাহ্য-জগতকে দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় বলিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন। কেহ বা অন্তর হইতেই বাহিরের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেহবা চিৎরূপী বিরাটের সহিত, অচিৎ বা জড়রূপী খণ্ডের মিলন সাধনের জন্য, চিৎ ও অচিৎ উভয়কে এক পরমেশ্বরের দেহ ও মনরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কেহবা এক চিৎ-এর স্বগত প্রকাশ ও বাধার স্বাভাবিক গতিতে প্রমাতৃচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য, অখণ্ড ও খণ্ড, উভয়ই আবির্ভূত ও নিরন্তর সম্মিলিত হইতেছে এই সার সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন। বাহ্যজগতের ও অন্তর্জগতের সমস্ত প্রকারের ব্যাপার সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রকাশ (position) ও বাধা (negation), এই দুই শরীরের মধ্যে সেই অশরীরী চিন্ময়ের নিত্য বিলাস দেখাইয়াছেন। সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই প্রকাশ ও বাধার স্বকীয় আকর্ষণ বিকর্ষণের দোলা চলিয়াছে, এবং সেই দোলার

ফলেই অখণ্ড হইতে খণ্ড ও খণ্ড হইতে অখণ্ডে সেই বিশ্বদেবতা ত্রিবিক্রমের ত্রিপাদবিক্ষেপ সার্থক হইয়া চলিয়াছে এই পরম তথ্যের প্রচার করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে চিন্ময়ের স্বভাব এই, যে তিনি প্রকাশ ও বাধার বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আপনাকে প্রকট না করিয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না। অখণ্ড হইতে খণ্ডে ও খণ্ড হইতে অখণ্ডে চিৎ-স্বরূপের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত ও প্রত্যাবর্ত্তিত হওয়াই তাঁহার স্বভাব ও সার্থকতা। আবার নব্যদার্শনিক Bergson প্রাণশক্তির স্বাভাবিক উন্মেষেই চিৎ ও অচিৎএর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এম্‌নি করিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের যুগলমিলনের তত্ত্বটি বিষয়ভেদে, ব্যাপারভেদে, যুগভেদে, দেশভেদে ও কালভেদে নানাভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, এবং চিৎএর দিক্ দিয়া, প্রাণের দিক্ দিয়া, গতির দিক্ দিয়া নানাভাবে তত্ত্বানুশীলিরা তাহাদের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধ যে শুধু চিন্ময় বা প্রাণময় নয়, ইহা যে একান্তভাবে একটি প্রেমেরও সম্বন্ধ এই নিগূঢ় রহস্যটি মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্যদেবের যুগে যেমন স্ফুট হইয়াছে এমন আর কখনও নয়।

আমরা খণ্ড ও সসীম বলিয়া সেই বিরাট্ ও ভূমাকে চাই। তাঁর সঙ্গে মিশিবার জন্য তাঁর মধ্যে আমাদের খণ্ডতাকে ডুবাইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছি। তিনি আমাদের খণ্ডতাকে চাহিয়া নিজে আপনাকে খণ্ডরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রত্যহ আমাদের দ্বারে আসিয়া তাঁর সত্তা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন এবং আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁরই অতুল প্রেম আমাদের প্রাণের মধ্যেও প্রেম জাগাইয়া দিয়াছে। তাঁর স্বরূপ বলিয়াই তিনি আমাদের চান এবং আমরাও আমাদের স্বরূপ বলিয়াই তাঁহাকে চাই। তিনি যদি আমাদের না চাহিতেন এবং আমরাও যদি তাঁকে না চাহিতাম তবে উভয়ের মধ্যে মিলনই বা হইত কি করিয়া, আর এত সাধন উপাসনাই বা টিকিত কি করিয়া। তিনি যদি তাঁর অনন্ত নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাঁর অনন্তের মধ্যে যদি অপূর্ণতা বোধ না করিতেন তবে আমরাই বা উৎপন্ন হইতাম কি করিয়া? আর তাঁর অনন্ততাইবা সার্থক হইত কি

করিয়া? তিনি যখন পূর্ণ, তখন খণ্ডে তার সার্থকতা; আবার তিনি যখন খণ্ড হয়ে আছেন তখন পূর্ণে তার সার্থকতা। তাঁর একটা রূপের প্রকাশের মধ্যে আর একটা রূপ লুকিয়ে থাকে, এবং লুকিয়ে থেকে তাঁকে ক্রমশঃ আর একটা রূপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। তার প্রকাশ এবং অপ্রকাশ, তার সত্য এবং বাধা, এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর চাঞ্চল্যকে সার্থক করে তুলে তাঁর মহিমাকে চিরজয়যুক্ত করে তোলেন; সত্য এবং বাধা এই দুটিই তাঁর স্বরূপ এবং এই দুটি রূপের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁকে সার্থক করে তোলেন। একটিকে দেখ্‌তে গেলে অপরটিকে তার বিপরীত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর তাৎপর্য্যই এই যে তা সত্ত্বেও তারা ভিন্ন নয়; বাস্তবিক উভয়টিরই একই আত্মা, কেবল ক্রমের ভিন্নতা প্রযুক্ত তাদের ভিন্ন স্বরূপ মনে হোতে পারে। সত্যের মধ্যেই বাধা এবং বাধার মধ্যেই সত্য, প্রকাশের মধ্যেই অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশের মধ্যেই প্রকাশটি নিহিত রহিয়াছে।

" রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি "

*　　*　　*

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তিহ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥

*　　*　　*

দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন
ধর্ম্ম ছাড়ি রূপে দুঁহে করয়ে মিলন
কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥

*　　*　　*

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥

*　　*　　*

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ
সম্যক আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ ॥
সেই পরম প্রেমময় কৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের স্বাভাবিক

পরিস্ফূর্ত্তি ও সার্থকতার প্রয়োজনেই এক দিকে যেমন জড় ও চিৎরূপে তিনি তাঁহাকে প্রকাশ করিতেছেন, অপর দিকে তেমনি সেগুলিকে নিরন্তর আপনার মধ্যে নানা দ্বার দিয়া সংহার করিতেছেন। এই সৃষ্টি ও লয়ের ইতিহাসেই সেই অলৌকিক প্রেমের সার্থকতা।

এ বিশ্ব শুধু চিদ্বিলাসবিবর্ত্ত বা প্রাণবিলাসবিবর্ত্ত নয়, ইহা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত।

"যেবা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত এক হয়
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়।"

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে, কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয় পুর।

আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।
তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে,—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাইত ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।